মাসিক

দা'ওয়াহ

THE MONTHLY DA'WAH

مجلة الدعوة الشهرية

www.monthlydawah.com

১ম বর্ষ; ৭ম সংখ্যা | জানুয়ারী ২০২০ ঈসায়ী | পৌষ ১৪২৬ বাংলা | জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র

- ইসলামি সভ্যতা পরিস্ফুটনে ইমাম আবুল হাসান আলী আননাদাওয়ীর অবদান
- মুসলমান: একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মিশনারি জাতি; জ্ঞানের ফেরিওয়ালা
- ভিশনারি মুসলিম
- প্রেমের নতুন আল্পনা

দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

مجلة الدعوة الشهرية

السنة الأولى، العدد السابع، يناير ٢٠٢٠م/ جمادى الأولى ١٤٤١هـ
تصدر من قسم الدعوة والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (এম.পি)
প্রফেসর ড. মোহা: শাফী উদ্দীন মাদানী
প্রফেসর ড. শাকের আলম শওক

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

জনাব মোহা: শাহজালাল

সম্পাদক

ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক

নির্বাহী সম্পাদক

আ.ফ.ম নূরুজ্জামান

সহযোগী সম্পাদক

- জাকিয়া বিনতে আলম
- শোয়াইব মাক্কী
- সাইয়্যেদ নূর
- সাইয়্যেদ মাহমুদুল হাসান

সম্পাদনা সহযোগী

- আ.ক.ম বদরুজ্জামান
- আছিয়া বেগম
- শরীয়তুল্লাহ
- হাদিকাতুল কুবরা
- আমান উল্লাহ
- মারজানাহ

মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা | Price : 5$

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াহ
দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
কুমিরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৭১৬ ১৪৯৫৫২/০১৬৭৩ ৯০৯২০৫
ই-মেইল ঃ monthlydawah@gmail.com
ওয়েব ঃ www.monthlydawah.com

দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি থেকে প্রকাশিত এবং আল-নূর কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, আনছারী প্লাজা (৩য় তলা), ৩২ নজির আহমদ চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত।

The Monthly Dawah

1st Year; 7th Issue | January 2020

“Monthly Dawah is a magazine published by the Department of Dawah and Islamic Studies of International Islamic University Chittagong, Bangladesh. Objectives of this Magazine are:

- To highlight the teaching of Islam to the people in general.
- To inspire all to have the real Islamic teachings.
- To present the great ideal of Islam.
- To spread the concept of moderate Islam by highlighting the stand of Islam against all kind of extremism & terrorism.”

“আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক দা'ওয়াহ।

মাসিক দা'ওয়াহ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে,

- সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরা।
- কুরআন সুন্নাহর সহিহ শিক্ষা গ্রহণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ইসলামের সুমহান আদর্শকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।
- জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থানকে তুলে ধরে মধ্যপন্থার চেতনাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া।”

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক ও হিউম্যান ডগ : কীসের আলামত? ♦ ০৩

দারসুল কুরআন

মুমিনের সত্যিকারের তওবা ♦ ০৪

দারসুল হাদীস

তাক্ওয়ার গুরুত্ব
- শায়খ সাইয়্যেদ নূর আল আযহারী ♦ ০৭

প্রবন্ধ

ইসলামি সভ্যতা পরিস্ফুটনে ইমাম আবুল হাসান আলী আননাদাওয়ীর অবদান
- ড. আব্দুস সালাম আজাদী ♦ ১০

মুসলমান: একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মিশনারি জাতি: জ্ঞানের ফেরিওয়ালা
- জিয়াউল হক ♦ ১৪

উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
- মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন ♦ ১৭

ইসলাম ও বিজ্ঞান

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র
- প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী ♦ ২২

বই পরিচিতি

মহাকালের শপথ
- আমান উল্লাহ ♦ ২৮

নিবন্ধ

ভিশনারি মুসলিম
- সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান ♦ ৩১

প্রেমের নতুন আল্পনা
- শায়খ মাহমুদুল হাসান ♦ ৩৩

বিশ্বনবী-কালজয়ী আদর্শের মূর্ত প্রতীক
- ডা. মোহাম্মদ ওমর ফারুক ♦ ৩৬

পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে
- এ আর বাহাদুর বাহার ♦ ৩৮

মানুষ একটি ছোট্ট পৃথিবী
- জহির তানভীর ♦ ৪০

মসজিদের কান্না
- নাইয়েরা হামীম ♦ ৪১

জীবন্ত গল্প

আমি কেন ও কীভাবে 'খৃষ্টান-কাফিরদের' দেশ বৃটেনের নাগরিক হলাম
- ড. আবুল কালাম আজাদ ♦ ৪২

সমকালীন প্রসংগ

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ইসলামের নির্দেশনা
- আবু যোবায়ের ♦ ৪৫

হেদায়েত

মুসলিম হওয়ার গল্প-(৪)
- মুহাম্মদ নূরুন্নবী ♦ ৪৬

আরবী ভাষা শিক্ষার আসর

আরবী প্রবাদ ও বাগধারা (১ম পর্ব)
মীযান হারুন ♦ ৪৮

মাসায়েল

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক
- মোঃ শাহ জালাল ♦ ৫০

কবিতা ♦ ৫২

ক্যাম্পাস সংবাদ ♦ ৫৫

কুইজ কনটেস্ট ♦ ৫৬

সম্পাদকীয়

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক ও হিউম্যান ডগ : কীসের আলামত?

বাংলাদেশে হিউম্যান মিল্ক প্রতিষ্ঠার খবর প্রচারিত হওয়ার পরপরই এ নিয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় এক ধরনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

ইসলাম ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কে যারা সচেতন তারা কোনোভাবেই এই ধরনের মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষে নন। তাদের এই অবস্থান অবশ্য মায়েদের অন্য শিশুদের দুগ্ধ দানের বিরুদ্ধে নয়। তাদের শংঙ্কা হচ্ছে, এই ধরনের মিল্ক ব্যাংক থেকে পান করা শিশুরা দুধ ভাই/বোন হয়ে যাবেন। তারা বড় হয়ে তাদের মধ্যে আবার বিবাহ শাদী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এতে ইসলামী শরীয়াতের সুস্পষ্ট বিধি লংঘন হয়ে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে দেশে জারজ সন্তান জন্ম নেবে।

হিউম্যান মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নটি নতুন ইস্যু নয়। এটি একটি পুরাতন ইস্যু। আশির দশকেই এ বিষয়ে সৌদি আরব, মিশরসহ বিভিন্ন দেশের ইসলামী পন্ডিতবর্গ ও ফতোয়া বোর্ড তাদের অবস্থান প্রকাশ করে এটিকে হারাম ঘোষণা করে। অবশ্য ইউসুফ কারদ্বাভীসহ গুটি কয়েক ইসলামী স্কলার হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দেয়।

বৈধ-অবৈধের প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায় নিয়ে যাওয়ার শামিল। একজন নারী তার নিজ শিশুকে দুগ্ধ দান করবেন এটাই স্বাভাবিক। এতে তার পর্দা, লজ্জা-শরম কোনো কিছুই বিসর্জন দিতে হয় না। কিন্তু একজন নারী যখন তার ঘর থেকে বের হয়ে কোনো হাসপাতালে গিয়ে মেশিনের সাহায্যে দুগ্ধ দান করবেন তখন তার লাজ-শরম, পর্দা বিসর্জন দিতেই হবে। বিভিন্ন ফার্মে গরু ছাগলের দুগ্ধ কালেকশনের সিস্টেম যদি আমাদের মা-বোনদের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয় তা বড়ই বেমানান। আমরা দেখেছি, পশু প্রেমিক ও পরিবেশবাদীরা গবাদি ফার্মে মেশিনের সাহায্যে দুধ কালেকশনের প্রতিবাদ করে আসছেন। তাদের দাবি, এভাবে জোর করে গরু ছাগল থেকে দুধ কালেকশন করা অন্যায়। এটা ন্যাচার বিরোধী কাজ। গবাদি পশু থেকে কৃত্রিম উপায়ে দুধ কালেকশন যদি নিন্দনীয় কাজ হয় তাহলে মানব নারীর স্তনে মেশিন লাগিয়ে দুগ্ধ কালেকশন আরো বেশী নিন্দনীয় ও লজ্জাস্কর কাজ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজধানীর হাতিরঝিলে এবার দেখা গেল, একজন পুরুষ মানবকে কুকুর সাজিয়ে গলায় রশি লাগিয়ে আরেকজন নারী তাকে নিয়ে হেটে বেড়াচ্ছে। "From the Portfolio of Doggedness" এর পুনরাবৃত্তি পারফরমেন্সের অংশ হিসেবে তারা এটি করে। ১৯৬৮ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ভেলি্য এক্সপোর্ট ও পীটার ওয়েভেল সর্ব প্রথম এই পারফরমেন্স শো করেন। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের যে সিস্টেম মানবের ওপর চাপানো হয়েছে তা চিত্রায়ন করা। এই স্ট্রিট শো এর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন একজন মানবকে কুকুর বানিয়ে গলায় রশি পেঁচিয়ে ঘুরে বেড়ানো গোটা মানবতাকে অপমান করার শামিল। আমাদের সমাজে নানা ধরনের অসংগতি আছে। সেইসব অংসঙ্গতির সমালোচনা করতে হবে সভ্যতা-ভব্যতা ও মানব রুচিকে বজায় রেখে।

উপরোল্লেখিত দুটি কাজই মানবতার জন্য হুমকি স্বরূপ। মাকাসিদুশ শরীয়াহর (Objectives of Islamic Shariah) অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবতার ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষণ করা। কিন্তু হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং হিউম্যান ডগ এর স্ট্রিট শো মাকাদিসুশ শরীয়াহকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এইসব কর্মকান্ড ভালো আলামত নয়। আমরা সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, বাংলাদেশের মাটিতে এমন কোনো কর্মকান্ড হতে দেয়া উচিত নয় যেসব কর্মকান্ড দেশের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধে যায়। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন।

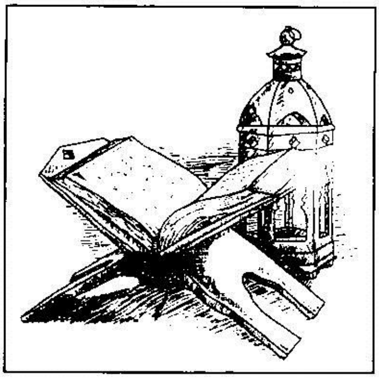

মুমিনের সত্যিকারের তওবা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তওবা করো, প্রকৃত তওবা। আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাদের দোষত্রুটিসমূহ দূর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত। (সূরা আত-তাহরিম : ৮)

ব্যাখ্যা:

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদের নসিহত করেছেন। কালামে হাকিমের যত স্থানে ঈমানদার ব্যক্তিদের আহবান করা হয়েছে, সকল স্থানে মুমিনদের নাজাত এবং সফলতা অর্জনের জন্য নানা ধরনের পরামর্শ, নির্দেশ এবং কৌশল বলে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত তার ব্যতিক্রম নয়।

আয়াতের প্রথম অংশ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তওবা করো, প্রকৃত তওবা'- প্রকৃত বা খাঁটি তওবা কী? এর ব্যাখ্যায় ইবন কাসির (র.) বলেন,

أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات

অর্থাৎ সত্য, একনিষ্ঠ ও খাঁটি তওবা যার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে এবং তওবাকারীর বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো ভাবনাগুলো একত্রিত করা হবে এবং মন্দ স্বভাবসমূহ দূর হয়ে যাবে।

আরবি ভাষায় (نصح) শব্দের অর্থ নিষ্কলুষতা ও কল্যাণকামিতা। খাঁটি মধু যা মোম ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে মুক্ত করা হয়েছে তাকে আরবিতে (عسل ناصح) বলা হয়। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে দেয়া এবং ফাটা ফাটা কাপড় ঠিক করে দেয়া বুঝাতে আরবি (نصاحة الثوب) শব্দ ব্যবহার করা হয়। অতএব, তওবা শব্দের সাথে نصوح বিশেষণ যুক্ত করলে হয় তার আভিধানিক অর্থ হবে এমন তওবা যার মধ্যে প্রদর্শনী বা মুনাফিকির লেশমাত্র নেই।

সত্যিকারের তওবা:

হযরত আলী (রা) একবার এক বেদুঈনকে মুখ থেকে ঝটপট করে তওবা ও ইসতিগফারের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বললেন, এতো মিথ্যাবাদীদের তওবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সত্যিকার তওবা কী? তিনি বললেন, সত্যিকার তওবার সাথে ছয়টি বিষয় থাকতে হবে তা হচ্ছে:

১. যা কিছু ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হও।
২. নিজের যে কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে গাফিলতি করছ তা সম্পাদন কর।
৩. যার হক নষ্ট করেছ তা ফিরিয়ে দাও।
৪. যাকে কষ্ট দিয়েছ তার কাছে মাফ চাও।
৫. প্রতিজ্ঞা করো ভবিষ্যতে এ গোনাহ আর করবে না।
৬. নফসকে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে গোনাহর কাজে অভ্যস্ত করেছ ঠিক তেমনিভাবে আনুগত্যে নিয়োজিত কর। এতদিন পর্যন্ত নফসকে যেভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার মজায় নিয়োজিত রেখেছিলে এখন তাকে তেমনি আল্লাহর আনুগত্যের তিক্ততা আস্বাদন করাও (কাশশাফ)।

হযরত হাসান রা. বলেন,

التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ تُبْغِضَ الذَّنْبَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ وَتَسْتَغْفِرَ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْتَهُ فَأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِالتَّوْبَةِ وَصَمَّمَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطِيئَاتِ

বিশুদ্ধ তওবা হলো এই যে, যেমন গুনাহর প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ ছিল ঐ রকমই তার প্রতি অন্তরে ঘৃণা জন্মে যাওয়া। যখন ঐ গুনাহর কথা স্মরণ হয়, তখন ক্ষমা প্রার্থনা করা। যখন কোন বান্দা তওবা

করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে নেয় এবং তওবার ওপর অটল থাকে, তখন মহান আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত গুণাহ মাফ করে দেন।

ইমাম গাজজালী (র.) তওবায়ে নাসুহার জন্য তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। ঐ তিন উপাদানের সমন্বয় হচ্ছে খাঁটি তওবা। উক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে-

১. তওবা সম্পর্কে 'ইলম' বা জ্ঞান থাকা। তওবাকারী গুনাহ সম্পর্কে জানবে এবং তা যে মাফ হতে পারে বা মহান আল্লাহ মাফ করতে পারেন তাও তার জানা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ
ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣

(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না? নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন? তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু? (সূরা আল যুমার : ৫৩)

২. তওবার সময় ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, যা তার আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত সে সম্পর্কে জানা থাকা।

ক. পাপ করার পর ব্যক্তির তীব্র দংশন, মানসিক আঘাত ও যাতনা তৈরি হবে। মনে হবে দুনিয়ায় তার সবকিছু থেকেও নেই। এ ধরনের কষ্ট, আঘাত ও মনোযাতনা তৈরি হবে। এর চিত্রায়ণে মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ
إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨

আর যে তিনজনের ব্যাপার মুলতবি করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও তিনি মাফ করে দিয়ছেন পৃথিবী তার সমগ্র ব্যাপকতা সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো, তাদের নিজেদের প্রাণও তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিজের রহমতের আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই, তখন আল্লাহ নিজ অনগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। অবশ্যি আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আত তাওবা : ১১৮)

তাঁর অনুশোচনা এমন হবে সে নিজেই মহান আল্লাহর কাছে অনবরত মাফ চাইতে থাকবে। যেমন আদম আ. ও হাওয়া আ. গাছের ফল খেয়ে অনুশোচনা করেছিলেন।

খ. সুদৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ। অর্থাৎ তওবার প্রাক্কালে অত্যন্ত একনিষ্ঠ, দৃঢ় ও শক্তভাবে এমন ওয়াদা করা যাতে কোন অবস্থায় কোনোভাবেই আর ঐ পাপ করার সামান্যতম অনুভূতি আর তৈরি না হয়। তওবাকারী অনুশোচনা করবে এবং সংকল্পবদ্ধ হবে ভবিষ্যতে নতুন করে আর পাপাচার করবে না। এর পাশাপাশি সে তার এ সত্য তওবা কবুল হওয়া থেকে নিরাশ হবে না। এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا۟ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ
لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا ٢٥

তোমাদের রব খুব ভালো করেই জানেন তোমাদের মনে কী আছে? যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগির নীতি অবলম্বন করার দিক ফিরে আসে। (সূরা বনি ইসরাইল : ২৫)

৩. বিশুদ্ধ তওবার কিছু বাস্তব পদক্ষেপ বা আমল করা অত্যাবশ্যক-

ক. তাৎক্ষনিক ঐ অন্যায় থেকে বিরত থাকা। কারণ ব্যক্তির মনে হতে পারে আচ্ছা যেহেতু অন্যায়টা শুরু করেই ফেলেছি তাহলে শেষ করি। এর পর তওবা করব। এতে কোনো ফায়দা হবে না। কারণ, সে তার নফস এর কাছে পরাজিত হয়েছে। তবে সে যদি তাৎক্ষণিক ঐ পাপ থেকে ফিরে আসতে পারে, তাহলে সে বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মত সওয়াবের অধিকারী হবে। মহান আল্লাহ তার জন্য সেখান থেকে ফিরে আসার পথ প্রদর্শন করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩

যারা আমার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাবো। আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশালীদেরই সাথে আছেন? (সূরা আল আনকাবুত : ৬৯)

খ. ইসতিগফার করা। অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা; আন্তরিকভাবে ঠিকমত ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারলে মহান আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন; এ ওয়াদা আল-কুরআনের অনেক স্থানে বিদ্যমান। সূরা হুদের ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ٩٠

"দেখো, নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। অবশ্যি আমার রব করুণাশীল এবং নিজের সৃষ্টিকে ভালোবাসেন।"

গ. পরিবেশ এবং বন্ধুদের পরিবর্তন করা। অর্থাৎ যেসব বন্ধুর সাথে চলাফেরা করলে এবং যেসব পরিবেশে গেলে তওবাকারী আবারও অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে, সেসব স্থান এবং ব্যক্তি পরিত্যাগ করা। কারণ বন্ধু দুই প্রকার। একজন হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে, আরেকজন জাহান্নামে নিয়ে যাবে। সেদিন বন্ধু বন্ধুর শত্রু হয়ে যাবে। তারা একে অন্যকে বলবে তুমিই আমাকে পথভ্রষ্ট করেছো। তবে সেদিন মুত্তাকি বন্ধু এ কাজ করবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٦٧

যখন সে দিনটি আসবে তখন মুত্তাকিরা ছাড়া অবশিষ্ট সব বন্ধুই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে। (সূরা যুখরুফ : ৬৭)

ঘ. মন্দ কাজের উল্টো কাজ করা। অর্থাৎ কোন মানুষ যখন অন্যায় এবং মন্দ কাজ করে তখন তা দেখে তার উল্টো কাজ করা। যেমন-

১. কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, তওবাকারী তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করবে।

২. কেউ মন্দ পত্রিকা পাঠ করে, সে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করবে।

৩. কোন ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তওবাকারী তা রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

৪. কেউ গান-বাজনা এবং মন্দ আড্ডায় অংশগ্রহণ করে, তওবাকারী কোন উপকারী ইলমের দারসে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৬) একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য খালিস তওবা হতে হবে; কোন ভয়-ভীতি, অনিষ্ট এবং ক্ষতির আশঙ্কায় কোন অন্যায় থেকে বিরত থাকলে তা তওবা হিসেবে কবুল হবে না। যেমন কেউ পিতার অবাধ্য হলো এবং পিতা তার সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলো, তখন সে ব্যক্তি যদি অনুশোচনা করে তখন তা কবুল করা হবে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সত্যিকারে তাওবা করার তাওফিক দিন।

দ্বীন ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়...
ভর্তি চলছে...
তাহযীবুল উম্মাহ আদর্শ মাদরাসা
প্লে-৮ম শ্রেণি • আবাসিক • অনাবাসিক • ডে কেয়ার
হিফয, নূরানী, নাজেরা
প্রধান ক্যাম্পাস : বাড়ি # ১৬, রোড # ০১, লেইন # ০১, ব্লক # এইচ, হালিশহর আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-৭১১৩৯৩, মোবাইল : ০১৮৬৭ ৩৮৫৬১৭
ইপিজেড ক্যাম্পাস : মান্নান চৌধুরী বিল্ডিং, ওয়াশিল চৌধুরী বাড়ি, কমিশনার রোড, বন্দর চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮৭৭ ৭২৫১৯১

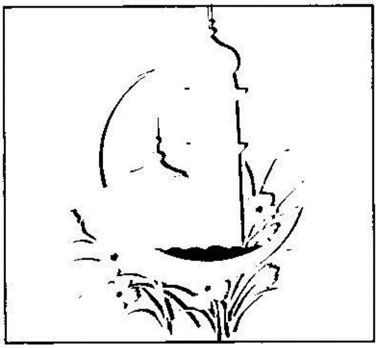

তাক্ওয়ার গুরুত্ব

শায়খ সাইয়্যেদ নূর আল আযহারী
খন্ডকালীন প্রভাষক
সাইন্সেস অব হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

عن أبى ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.

সরল অনুবাদ

আবূ যার গিফারী (রা.) বলেন, আমাকে রাসূল (সা.) বলেছেন: তুমি যেখানে থাকো আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।[১]

হাদিসটির আলোচ্য বিষয়:

আলোচ্য হাদিসে নবী কারীম (সা.) তিনটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। এক: সর্বদা সবখানে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা বা মুত্তাকী হওয়া। দুই: কোন পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎ কাজ করা। তিন: মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা।

তাক্ওয়ার পরিচয়:

তাক্ওয়া আরবি শব্দ। وِقَايَةٌ মূল ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ বেঁচে থাকা, আত্মরক্ষা করা বা নিষ্কৃতি পাওয়া ইত্যাদি। তাকওয়া বলতে সাধারণত আল্লাহ ভীতি বুঝায়।

পরিভাষায়:

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অপরাধ, অন্যায় ও অপছন্দনীয় চিন্তা, কথা ও কাজ থেকে আত্মরক্ষার মনোভাবকে তাক্ওয়া বলা হয়।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পে সন্তুষ্টি থাকা এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নাম তাক্ওয়া।

উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে ওমর (রা.) তাক্ওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনি কি কখনো কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? জবাবে ওমর (রা.) বলেন হ্যাঁ। পুনরায় উবাই ইবনে কা'ব (রা.) প্রশ্ন করেন, তখন আপনি কি করেছেন? ওমর (রা.) বলেন, আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করেছি। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, এটাই তাক্ওয়া। আর যিনি তাক্ওয়া অবলম্বন করেন তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে তাক্ওয়া হচ্ছে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়সমূহ পালন করা এবং হারাম, মাকরুহ ও সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ বর্জন করা।

তাক্ওয়া উম্মাতের প্রতি নবী কারীম (সা.) এর গুরুত্বপূর্ণ নাসীহাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর হক্ব এবং বান্দাহর হক্ব সংরক্ষণ হয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল জাতির জন্য তাক্ওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে-

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله

"অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্ববর্তী যাদেরকে কিতাব দিয়েছি এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে আল্লাহকে ভয় করো"।[২]

আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাক্ওয়ার হক্বদার বা ভয়ভক্তি করার যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমাশীল। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- هو أهل التقوى وأهل المغفرة

"তিনিই ভয়ভক্তি করার যোগ্য পাত্র এবং তিনিই পরিত্রাণের যথার্থ অধিকারী।[৩]

হাদিসে এসেছে-

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية (هو أهل التقوى وأهل المغفرة) قال الله تعالى: أنا أهل التقوى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له

"আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন নবী কারীম (সা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন"তিনিই সেই সত্তা যাকে ভয় করা উচিত আর তিনিই বান্দার পাপ মার্জনা করার অধিকারী" আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ আমিই

কেবলমাত্র বান্দার জন্য ভয়ের যোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে, আমার সাথে কাউকে অংশীদার স্থির করে না, তাকে মাফ করার যর্থাথ অধিকারী আমিই।[৪]

তাক্ওয়ার পুরস্কার:

প্রত্যেক মানুষ প্রত্যাশা করে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন, পর্যাপ্ত রিযিক, কাজকর্মে সহজসাধ্যতা এবং পরকালীন সফলতা। আর আল্লাহ তা'আলা এ সবই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাক্ওয়া অর্জনের মধ্যে। কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে-

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য চলার পথ বের করে দেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা এমনভাবে করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।[৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا "যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।[৬] তাক্ওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিদান বান্দার গুনাহ মার্জনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমাত প্রাপ্তি। কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন, তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের অধিকারী।[৭]

বান্দাহ মানবীয় দূর্বলতায় কখনো কখনো ফরয বা আবশ্যকীয় বিধান ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে পাপে নিমজ্জিত হতে পারে, আবার কখনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে সীমালংঘন করতে পারে তাই রাসূল (সা.) অত্র হাদিস কাফ্ফারা স্বরূপ সাথে সাথে সৎ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- إن الحسنات يذهبن السيئات "নিশ্চয়ই সৎ কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়।[৮]

অত্র হাদিসে الحسنات দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওবা। অতএব বান্দাহ যখনই কোন পাপ কাজ করবে সাথে সাথে তাকে তাওবা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم

"নিঃসন্দেহে তাওবা তাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করে, তারপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে আল্লাহ তাদের তাওবা কবূল করেন।[৯] যদি পাপ কাজ প্রকাশ্যে করে তাহলে তাওবা প্রকাশ্যে করবে আর পাপ কাজ গোপনে করলে তাহলে তাওবা গোপনে করবে। যেমন একটি মুরসাল হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) মু'আয বিন জাবাল (রা.) কে বলেছেন: হে মু'আয সাধ্য মতে আল্লাহকে ভয় করো এবং আমল করো। যদি কোন গুনাহ হয়ে যায় তার জন্য তাওবা করো, যদি গুনাহ গোপনে হয় তাহলে তাওবাও গোপনে আর প্রকাশ্যে হলে তাওবাও প্রকাশ্যে করো।[১০]

আলোচ্য হাদিসে রাসূল (সা.) এর তৃতীয় ওসীয়ত হচ্ছে মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো, চরিত্র সুন্দর করো। প্রকৃতপক্ষে এটি তাক্ওয়ার একটি শাখা। আলাদাভাবে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেকে মনে করেন তাক্ওয়া হলো বান্দাহর হক্বের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র আল্লাহর হক্ব পালন করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহারকে তাক্ওয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

"মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা ব্যয় করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায়, আর যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং লোকজনের প্রতি ক্ষমাশীল। আর আল্লাহ সৎকর্মীদের ভালোবাসেন।[১১] রাসূল (সা.) হাদিসে সৎ চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এটিকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ণতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চরিত্রবানদের জন্য মহা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا

"মু'মিনদের মধ্যে যার চরিত্র সুন্দর তিনিই পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী"। অপর আরেকটি হাদিসে এসেছে-

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم والقائم

"নিশ্চয়ই মু'মিন সৎ চরিত্রের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোযা পালন এবং রাত্রিতে দাঁড়িয়ে ইবাদাত করার মর্যাদা লাভ করবে।[১২] উত্তম চরিত্রের প্রতিদান মীযানে সবচেয়ে ভারী বস্তু হিসেবে পরিগণিত হবে। নবী কারীম (সা.) অন্যত্রে বলেছেন, তাক্ওয়া এবং উত্তম

চরিত্রের মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ক্রোধান্বিত না হওয়া, রাগ সংবরণ করা, হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ করা, ক্ষমা করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং দান-সাদাকাহ করা ইত্যাদি উত্তম চরিত্র।

হাদিসটির শিক্ষা:

* সর্বদা সবখানে খোদাভীতি অন্তরে স্থাপন করা।
* মুত্তাকীদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।
* কোন পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবার মাধ্যমে ফিরে আসা।
* সকলের সাথে উত্তম আচরণ করা।
* সৎ চরিত্রবান লোক আল্লাহর নিকট প্রিয়।

উত্তম চরিত্র, নেক আমল সর্বোপরি তাকওয়া বা খোদাভীতিই মানুষকে পরকালীন মুক্তি দিতে পারে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন এবং তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুক। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. সুনান আত তিরমিযী ১৪৪/২, হাদিস নং-১৯৮৭, মুসনাদে আহমদ ১৫৩/৫
২. সূরা নিসা, আয়াত-১৩১
৩. সূরা মুদাচ্ছির, আয়াত-৫৬
৪. সুনান আত তিরমিযী, হাদিস নং-৩৩২৮
৫. সূরা ত্বালাক, আয়াত-০৩
৬. সূরা তালাক, আয়াত-০৪
৭. সূরা আনফাল, আয়াত-২৯
৮. সূরা হুদ, আয়াত-১১৪
৯. সূরা নিসা, আয়াত-১৭
১০. হিলয়া ২৪০/১
১১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩৩-১৩৪
১২. মুসনাদে আহমাদ ৯০/৬

দাওরায়ে হাদিস এবং দাখিল ও আলিম বিজ্ঞান বিভাগ সমৃদ্ধ একটি মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আবাসিক । অনাবাসিক । ডে-কেয়ার

ভর্তি চলছে

❖ নার্সারি - কামিল (পৃথক বালিকা শাখা)
❖ নার্সারি - আলিম (পৃথক বালক শাখা)
❖ মিশকাত ও দাওরায়ে হাদিস (শুধু ছাত্রী)
❖ হিফজখানা (বালক ও বালিকা পৃথক)
❖ সহিহ কুরআন শিক্ষা বিভাগ (২ টা - ৪ টা)

● সহিহ আকিদা, ইবাদাত, পর্দা, আমল-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।
● ক্লাসের বিষয়ের পাশাপাশি সহিহ কুরআন, নাহু-সরফ, আরবি ও ইংরেজি ভাষা চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ।
● লেখাপড়ার পাশাপাশি কম্পিউটার, রান্নাবান্না, সেলাই, বিবিধ হাতের কাজ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ।
কঠোর নিরাপত্তা, বিশ্বস্থ অভিভাবকত্বের নিশ্চয়তাসহ ছাত্র ও ছাত্রী পৃথক মানসম্পন্ন হোস্টেল ব্যবস্থা।
শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ৩টি মাইক্রোবাস ও ১টি টেম্পুসহ ৪টি নিজস্ব পরিবহণ।

১ আলিম পরীক্ষা দিয়ে / কাওমি মাদরাসা থেকে সরাসরি মিশকাত বা দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি করা হয়।

হিফজুল কুরআনের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও গণিত ইত্যাদি বিষয় পাঠদান করা হয়।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী/বয়স্ক মহিলারাও সহিহ কুরআন ও নামাজ শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন।

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
মীর মুহাম্মদ ইউসুফ ছানুভী
খতিব: সরকারি হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ জামে মসজিদ
মহাসচিব: চট্টগ্রাম প্রাইভেট মাদরাসা এসোসিয়েশন
মোবাইল : ০১৮১৬ - ৩২০ ৭৬৮, ০১৯৭৬ - ৩২০ ৭৬৮
বিকাশ : ০১৮৩৯ - ৯৮০ ১৮১, অফিস : ০১৮১৮ - ৯১১ ৬৭৫

আইডিয়াল গার্লস মাদরাসা
আইডিয়াল বয়েজ মাদরাসা ● বালক ও বালিকা হিফজখানা
খাজারোড (বহদ্দারহাটের পূর্বে চৌধুরী স্কুলের পশ্চিমে), চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। Email : idealgirlsfm@gmail.com
Visit us Website www.idealgirlsfm.edu.bd facebook Mir Mohammad Yousuf Sanowi ● Ideal Girls Madrasah

ইসলামি সভ্যতা পরিস্ফুটনে ইমাম আবুল হাসান আলী আননাদাওয়ীর অবদান

ড. আব্দুস সালাম আজাদী
লেখক: Director, Swansea Islamic Academy, London
সাবেক চেয়ারম্যান, দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি।

ভারতের ইমাম নাদাওয়ীকে জানি সেই ছোট বেলা থেকে, শায়খ রিযওয়ানুল কারীম (র) বা সাতক্ষীরার হুজুরই সর্বপ্রথম আমাকে তাঁর বই এর সন্ধান দেন। তাঁকে যত পড়েছি ততই মনে হয়েছে বিশ শতকে যাঁরা মুজাদ্দিদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি গণ্য হবার বেশী হকদার। তার কিছু চিন্তাধারার কথা আজ বলি, বুঝতে পারবেন তিনি মুসলিম বিশ্বকে কীভাবে তার চিন্তা দিয়ে পথ দেখিয়ে গেছেনঃ

১। কুরআনকে তিনি মুসলিমদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় বলেছেন। তিনি একাধিক বই লিখে এই জীবন বিধানের গুরত্ব বুঝিয়ে গেছেন। তাঁর অনেক কথা কুরআন সম্পর্কে কোড করার মত। তবে আমি তার যে কথা থেকে উপকৃত হয়েছি বেশি, তাহলো, 'কুরআনকে বুঝুন কুরআনের মত করে। মনে রাখবেন, কুরআনের তাফসীর কুরআন নয়, ঐটা এই কিতাবকে একজন মানুষ যা বুঝেছেন তা। ঐ বুঝটাই কুরআন নয়। আপনি নিজে বুঝার চেষ্টা করুন কুরআনকে। না বুঝলে মক্তিমাম অনুবাদটা কোন ভালো আলিমের মাধ্যমে শিখে নেন, তারপর নিজে নিজে পড়ে তা থেকে হিদায়েত নিন, দেখবেন আপনার জীবন কেমন ভালোভাবে পালটে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভালো লাগবে আপনি সত্য মিথ্যার মাঝে প্রভেদ বুঝবেন নিজে নিজেই।

২। তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে একটা আর্টিকেল লেখেন হাদীসের সাহিত্য মান নিয়ে। তিনি বলতেন, এই যে তোমরা সাহিত্য সাহিত্য কর, কুরআনের সাহিত্যকে একটু বোঝ, হাদীসের সাহিত্যমান নিয়ে একটু ভাব। এখানের শব্দের গাঁথুনি, বাক্যের দ্যোতনা, ভাবের বিশালতা, রাবীর প্রকাশ ভংগী, রাবীদের বর্ণনার পার্থক্যে ভাষা ও ডাইলেক্টের (Dialect) ব্যবহার দেখ, আপ্লুত হও। আরো বেশ কিছু সাহিত্য ললিতকলার নানা দিক তিনি তুলে ধরেন ঐ ১৯২৮ সালের দিকে এই লেখাটিতে। আর্টিকেলটি প্রকাশিত হয় কায়রোর মুজাম্মা' আললুগাহ এর জার্নালে। তার সেই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ইসলামি সাহিত্য ধারার এক বিশেষ দর্শন। এগিয়ে আসেন আব্দুর রহমান রাফাত আল বাশা, ড. নাজীব কিলানী, সাইয়েদ কুতুব এবং মুহাম্মাদ কুতুব। তারা একযোগে শায়খ নাদওয়ীকে ইসলামি সাহিত্যের ইমাম মনে করেছেন। রাবেতাতুল আদাব আল ইসলামি আল আলামিয়্যাহ বা ইন্টারন্যাশনাল কনেভেনশান ফর ইসলামিক লিটারেচারের তিনি সভাপতি ছিলেন আমৃত্যু। সারা দুনিয়ার প্রধান ভাষাতে ইসলামি সাহিত্যের এই চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে লক্ষ তরুণ।

৩। আমার গবেষণা "ভাষা ও সাহিত্য ইসলামি করণে শায়খ নাদাওয়ীর অবদান" বই আকারে বের হয়েছে কায়রো থেকে। বইটা কয়েক এডিশান আলহামদুলিল্লাহ বের হয়েছে। এই গবেষণায় ফুটে উঠেছে একটা ভাষাকে কীভাবে ইসলামী করণ করতে হয় সে সম্পর্কে ইমাম নাদাওয়ীর দর্শন। শব্দের নির্মাণ, বাগধারা ও বাকরীতির প্রয়োগ পদ্ধতি, রূপকল্পতা তৈরিতে সামগ্রিকতা ইত্যাদি নিয়ে তিনি ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শব্দ যে শুঁকে শুঁকে ব্যবহার করতে হয় তা তিনি দারুনভাবে লিখেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা কীভাবে লিখতে হয়, সেখানে ইসলামি রং কীভাবে প্রলেপন করতে হয় তা তিনি দেখিয়েছেন। কবিতার নানা ফর্ম, গল্পের নানা প্রকরণ, উপন্যাসের মডেলিং, বক্তৃতার নীতিমালা, তিনি নিজে লিখে, অথবা ইসলামের নানা সাহিত্যিকের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন।

৪। ইসলামের ইতিহাস পঠন, পাঠন বা রচনা করার তিনি অনেকগুলো দর্শন দান করেছেন। তিনি মনে করতেন, ইসলামের ইতিহাসে তথ্য বিকৃতির

সয়লাব অনুধাবন করতে যেয়ে কুরআন ও হাদীসকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। তিনি মনে করতেন, ইসলামের ইতিহাসকে মুসলমানদের ইতিহাস বানানো হয়েছে। আসলে এখানে জানা উচিত ছিলো, ঐতিহাসিক একজন ফটোগ্রাফার নন, তিনি দৃশ্যের পেছনের দৃশ্য তুলে আনবেন। যেমনটা করেছেন ইবন খালদুন। তিনি তাবারীকে অনেক সময় ফটোগ্রাফারের মত বলেছেন। তিনি বলতেন, ইসলামের নবী (সা) বলে গেছেন, "কিয়ামত পর্যন্ত আমার এই উম্মাতের একটা না একটা দল হক নিয়ে বিজয়ী থাকবেই"।

তিনি বলেছেন, ইতিহাসকে আমাদের নবীর এই বাণীর আলোকে পড়। তুমি যদি কোন যুগে এই বিজয়ের শুন্যতা দেখতে পাও, ভেবে নিও ঐ শুন্যতা ইসলামের না, ঐ শুন্যতা ইতিহাসের। এটা এক যুগান্তকারী দর্শন। এর আলোকে ড. ইমাদুদ্দিন খালিল ইতিহাস দর্শনের ওপর ৫টি বই লিখেছেন, ড. কারাদাওয়ীও লিখেছেন। সেখানে ইসলামী ইতিহাস লেখার মূলনীতি চলে এসেছে। এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে লেখা তার নিজের বই, কিং ড. মাহমুদ শাকেরের বই পড়ুন, ড. মোহর আলীর বই পড়ুন দেখবেন, ইসলাম বিশ্ব থেকে কোনদিন হারায়নি। এর প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কোন যুগেই মরেনি। যদিও হয়ত বিশ্ব শক্তি হিসেবে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তিনি এই দর্শন থেকে বুঝাতে চেয়েছেন ইসলামি বিজয় বা সঠিক ইসলাম যাপনকারীদের বিজয় সব সময় থাকে, ছোট পরিসরে হলেও। এটা কখনো কেটে যায়নি, যাবেও না। কাজেই ইসলামি ব্যবস্থা কায়িমে নিরত মানুষদের মনে এটা দিয়ে দেয় দারুন অভয়।

৫। ইসলামি রাস্ট্র ব্যবস্থা কায়িম করা বা কায়িম থাকা তিনি অত্যাবশ্যক মনে করতেন। তিনি মাওলানা আবুল আ'লা মাওদূদীর সাথে মিলে জামাআতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৪২ সালে বের হয়ে আসলেও ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের সাহায্য করেছেন এবং জামাআতে ইসলামীহিনদের ইনভাইটেড সদস্য হিসাবে মাঝে মাঝে শুরা বৈঠকে হাজির হতেন। তিনি তাবলীগের মুরব্বিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং হতেন। তিনি ইখওয়ানের স্পীরিচুয়াল লীডার ছিলেন। সাইয়েদ কুতুব বলতেন, আবুল হাসান নাদাওয়ীর 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইটা না পড়ে ইসলামী আন্দোলনে টিকে থাকা যাবে না। তার 'আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ইখওয়ানদের সাথে কথা বলতে চাই' বইটা এক সময় ইখওয়ানের পাঠাবশ্যক বই ছিলো, সবাইকে পড়তে হত। বড় বড় নেতাদের ফাঁসি দেয়ার সময় এই বইটা ইখওয়ানকে মারাত্মক ঝামেলা থেকে রক্ষা করেছে। তিনি তুরস্কের আরবাকানের খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তার লেখা বইগুলোর অনেকটাই ছিলো সেখানে ইসলামি আন্দোলনের খোরাক। হাসান তুরাবী তাকে শুধু নেতা মনে করতেন না, তার সামনে ছাত্রের মত জড়সড় হয়ে বসতে দেখেছি আমি নিজে। মালায়েশিয়ার 'পাসের' ক্রান্তি লগ্নে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিক আবুল আযীযের তিনি ছিলেন ঘনিষ্ট বন্ধু। ইসলামি আন্দোলন কর্মীদের তিনি বলতেনঃ রাস্ট্র প্রতিষ্ঠা তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য বানিওনা, ইসলামের সেবক হও, ইসলাম পালন কর, দাওয়াতী চেতনায় এমন মুসলিম হও যাতে তুমি মুত্তাকীনদের ইমাম হতে পারো। তিনি একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। এবং দ্বীনের মূল লক্ষ্য হিসেবে বলতেনঃ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসে বের করে আনো, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখিরাতের বিশাল আঙ্গিনায় নিয়ে এসো, ধর্মের শেকল থেকে বের করে ইসলামের ইন্সাফে নিয়ে আসো। ড. ইউসুফ কারাদাওয়ী বলেন, সাহাবী সাইয়িদুনা রিবঈ আদ্দায়লামীর (রা) এই বক্তব্য আমি শিখেছি ইমাম নাদাওয়ির কাছ থেকে। তিনি গ্রামে গ্রামে স্কুল পাঠাগার, গঞ্জে গঞ্জে স্বাস্থ্য সেবার দারোন্মোচন, মানুষের কাছে ছুটে যাওয়ার মানসিকতাকে ইসলামী আন্দোলনের পথ হিসেবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইসলামী আন্দোলন কর্মীকে সাধারণ মুসলমান থেকে আরো একটু সামনে আসতে বলেছেন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোয় আলোকিত হয়ে।

ইসলামি আন্দোলন কর্মীদের তিনি বুঝাতেনঃ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ কর, কিন্তু ঐটাকে মুখ্য ভেবো না, অনেক নবী (আ) রাষ্ট্র দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তারা অদ্যাবধি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্থক মানুষ। রাষ্ট্র ব্যবস্থা আসে অন্য যোগ্যতায়। যদি একঝাক মানুষ মানবতার কল্যাণের এমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে, যারা আল্লাহ তার বান্দাদের তদারকি করার উপযুক্ত মনে করেন, তখন তাদের হাতে ক্ষমতা দেন। তিনি বলেছেন, আমি মুসলিম বিশ্বে ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে এক মুসলিমের পরিবর্তে অন্য মুসলিমকে প্রতিস্থাপন করার চেয়ে ঐ যায়গায় ইসলামকে নিয়ে যাওয়া প্রাধান্য দেই। উফাদ্দিলু ঈসালাল ইসলাম ইলাল কারাসী 'আলা ঈসাল আহলিহী ইলাল কারাসী।

৬। তিনি পাশ্চাত্যে এসে ইসলামি জীবন যাপনের ওপর অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলতেন, ইসলামের মুজিযার একটা দিক হলো আপনি যে কোন স্থানে যে কোন পরিবেশে ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতে যেতে পারেন। এমনকি কাফিরদের দেশে থেকেও। তিনি বলেছেন, আপনারা যে যে দেশে আছেন তার অধিবাসীরা আপনাকে কী মনে করে? আপনার প্রতিবেশিরা আপনাকে তাদের বন্ধু ও উদ্ধারকারী মনে করে কিনা। আপনার সন্তানেরা আপনাকে দ্বীন পালন করে সফল হিসেবে দেখে কিনা, এটা চিন্তা করবেন। আপনি যদি এদের গর্তে পড়ে যান, আর আপনার সন্তানেরা আপনাকে যদি দেখে দ্বীন পালন করছেন আপনি বেদ্বীনের কাঁধে চড়ে, তাদের খুদ কুড়া খেয়ে, তাহলে ইসলামের অ্যাম্বেসেডর হতে পারবেন না আপনি। তিনি সব সময় বলতেন একটা মুখের তিল যেমন মুখকে সুন্দর করে দেয়, অমুসলিমদের মাঝে আপনার অবস্থানকে তেমন করেন।

৭। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি বলতেনঃ অর্থ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সম্পদশালী হওয়ার মানসিকতা কখনো ইসলামে ছিল না, এখানে মানবতার কল্যাণে অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করতেই ইসলাম তার অর্থনীতির সাম্যতা দিয়েছে। এখানে এমন এক জনগোষ্ঠি গড়ে তুলতে হয় যারা উপরের হাত হবে, দান করবে, যাকাত দেবে। এবং যাকাত নেয়ার সময় হাত গুটাবে। আর এই নীতি হলো ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যাপী তার চেষ্টা, যেখানে ব্যক্তির লাভ লোকসানই একমাত্র লক্ষ্য থাকেনা।

৮। ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তার চিন্তাধারা আজ সর্ব মহলে স্বীকৃত। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ হয়েছে তাদের আসল শিক্ষা শেষ করে অনৈসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের ঘরে ঘরে চালু করাই। তিনি সেক্ষেত্রে মুসলমানদের সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাতে তাদের পশ্চাতপদতাই এই বিপদের অন্যতম কারণ। তিনি বলেছেন, শিক্ষার মর্ম এরা বুঝেনি, এদের গোঁড়ামি, ও অল্পবিদ্যা তাদের সর্বনাশ করেছে। তিনি বলতেন, আলকাদীম আসসালেহ, ওয়াল জাদীদ আননাফি' বা পুরাতন যেসব জিনিষ আজকের যামানায় চালানো যায় তা নেয়া, আর যেসব উপকারী জিনিষ নতুনভাবে এসেছে তা গ্রহণ করা হবে আমাদের শিক্ষানীতি। সব পুরাতন এখন আর নেয়ার মত নেই, সব নতুন ও এখন ফেলে দেবার নয়। তিনি বলতেনঃ শিক্ষানীতিতে তিনটি স্তর থাকবে। তা হলো একজন ছাত্রকে যা শিখতেই হবে। তা হলো ইসলামের বুনিয়াদী দিক সমূহ। এরপর বর্তমান চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ও সবক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মত সাধারণ বিষয়গুলো পড়ানো। এরপরে আসবে স্পেশালাইজেশান। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে শুধু নির্দেশ দেননি তার আলোকে তিনি একাধিক ইউনিভার্সিটি গড়ে দেখিয়েছেন কিভাবে তা সম্ভব।

৯। তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি গঠন, পরিবার গঠন ও সমাজ গঠনে বেশি প্রাধান্য দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন পরিবার এমন এক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামের দূর্গ হিসেবে গণ্য হয়। তাকে নড়বড়ে করে রাষ্ট্র রাষ্ট্র করে ব্যস্ত থাকা আত্মহত্যার মত। তিনি মনে করতেন ইসলামি সমাজব্যবস্থা এমন এক শক্তিশালী ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্র শক্তিও মাঝে মাঝে খেই হারায়ে ফেলে। তিনি বলেছেন, আমি অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, তাতার আক্রমনের পরে ইসলাম শেষ হয়ে যাবার কথা ছিলো।

কিন্তু তা না হয়ে তাতাররাই বরং ইসলাম গ্রহণ করে, এবং ইসলামের জন্য অনেক যুদ্ধও তারা করে। তিনি বলেছেন, ইতিহাসে এটাই প্রথম যে কোন বিজয়ী শক্তি পরাজিতদের ধর্ম গ্রহন করেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। এটা সম্ভব হয়েছিলো ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ শক্তিতে। তিনি দেখায়েছেন ইসলামের ইতিহাসে রাস্ট্রপ্রধান প্রায়ই ভালো আসতে পারেনি, কিন্তু শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থার কারণে ইসলামকেও শেষ করতে পারেনি। এইক্ষেত্রে মসজিদের মিম্বরকে তিনি বড় গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি বলতেন, একতার ডাক, দ্বীনের সঠিক শিক্ষা, জাহিলিয়্যাতের বিরুদ্ধে সবাই মিলে পাহাড়ের দেয়াল দেয়া সমাজকে সুন্দর করার মৌলিক হাতিয়ার।

১০। তিনি ইসলামের রাস্ট্রের ভৌগলিক অবস্থানের জাতীয়তাবাদী চেতনার অনেক বেশী সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ক্ষণভঙ্গুর হয়। কাজেই আন্তর্জাতিক মোর্চা তৈরি ও বৈশ্বিক কনভেনশানের প্রতি তিনি সবসময় মুসলিম রাস্ট্রপ্রধানদের অনুরোধ করেছেন। বাদশাহ ফয়সালের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়। ওআইসি ও রাবেতার প্রতিষ্ঠায় আল্লামা নাদাওয়ীর অবদান ছিলো অনেক বেশি।

১১। তিনি বর্তমান যুগে কলম যোদ্ধা হওয়ার ওপর অনেক গুরত্বারোপ করেছেন। ভাষাকে আয়ত্বে আনতে উলামায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশ সফর কালে তিনি আলিমদেরকে খুব মারাত্মক ভাষায় সমালোচনা করেন। সে সময়ে আমার ছোট্ট মনে তার একটা কথা এখনো দাগ কেটে আছে। তিনি বলেছিলেন, আমার জানা মতে মুসলমানেরা মাত্র দুইটা ভাষা জন্ম দিয়েছে। প্রথমটা বাংলা। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের হাতে তার নতুন জন্ম হয়। আর আরেকটা হলো উর্দু ভাষা। উর্দূকে আমরা এখনো আমাদের হাতে ধরে রেখেছি। পৃথিবীর ইসলামী ভাষা হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আর বাংলাকে আপনার অন্যের কোলে ছেড়ে দিলেন, আর তা দখল করে নিলো পৌত্তলিকদের ধ্বজাধারিরা।

তার সেই যুগান্তকারী ধর্মকে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত কাওমী মাদ্রাসাগুলোতে এখন বাংলা চর্চিত হচ্ছে এবং আশা করা যায় সৈয়দ আলী আহসান যেটা বলতেন, আমরা কোলকাতার বাংলা থেকে ঢাকার বাংলাকে আলাদা করতে চেয়েছি। আর আল মাহমুদ যে বলেছেন, আজ কোলকাতার বাংলা থেকে ঢাকার বাংলা দৃশ্যতঃভাবে আলাদা হয়েছে। ঢাকাই এখন বাংলা ভাষার রাজধানী। এটাকে আলিমরা ভালো একটা পর্যায়ে নেবেন। প্রায় ২৫০ টার মত বই লিখেছেন উর্দূতে ও আরবীতে। শত শত বিষয়ে মুসলিমদের পথ দেখিয়েছেন। তার কিছু কিছু বই ছিলো বেস্ট সেল। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চতম মাক্বাম দান করুন।

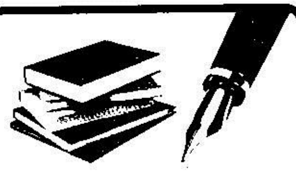

সংকল্প প্রকাশন
জ্ঞানান্তরের ঘূর্ণিপাকে

সৃজনশীল ও ইসলামিক সকল প্রকাশনীর
বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

যে সমস্ত পাবলিকেশনের বই পাওয়া যায়ঃ-

- সিয়ান পাবলিকেশন
- রুহামা পাবলিকেশন
- আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন
- গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
- সীরাত পাবলিকেশন
- সমকালীন প্রকাশন
- সবুজ পত্র প্রকাশন
- মাকতাবাতুল আসলাফ
- মাকতাবাতুল বায়ান
- পিস পাবলিকেশন সহ

দেশের উল্লেখযোগ্য সকল ইসলামিক প্রকাশনার
বই সুলভ মূল্যে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

গুলজার টাওয়ার (৩য় তলা)
২৮ নং দোকান, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
০১৮৪৫৮৭৬৭০৫, ০১৯১৭১২৭৭৪৯, ০১৭১৯৭৯১৩১১

মুসলমান: একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মিশনারি জাতি; জ্ঞানের ফেরিওয়ালা

জিয়াউল হক

গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকার, লন্ডন প্রবাসী।

অষ্টম শতাব্দির মধ্যভাগ। খুব সুনির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় ৭৫১ খৃষ্টাব্দ। চীনের পশ্চিমাংশে তখন তুর্কি প্রধান এলাকায় চীনা তাং (Tang) রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তাং রাজবংশের সাথে, তথা, চীনা সৈন্যদের সাথেই মুসলমানদের সংঘাত বাধে এবং তা এক সময় ভীষণ যুদ্ধের দিকে গড়ায়। ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধটাই 'বেটল অব তালাস (Battle of Talas)' নামে সুপরিচিত হয়ে আছে। উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে চীনারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। অনেক চীনা সৈন্য যুদ্ধবন্দি হয়ে মুসলমানদের অধিকারে আসে।

এইসব বন্দিদের মধ্যে একজন বন্দি এমন ছিল, যে কাগজ তৈরিতে দক্ষ ছিল। চীনে তখন কাগজ তৈরি হতো। ধৃত বন্দি ব্যক্তিটি মুসলমানদেরকে শুকনো খড় ও গাছের গুল্ম এবং সেই সাথে তুলো মিশিয়ে মন্ড তৈরি করে বিশেষ পদ্ধতিতে কাগজ বানানোর কৌশলটা শিখিয়ে দেয়।

এই প্রথমবারের মতো মুসলমানদের হাতে কাগজ বানানোর প্রযুক্তি এলো। আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা বুঝা সত্যিই খুব কঠিন আমাদের জন্য। এটা এমন একটা সময় ঘটছে যখন বিশ্বের বুকে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে চলেছে প্রায় সমান্তরালভাবে।

এই অষ্টম শতাব্দির মাঝামাঝি সময়কালেই দামেশকে উমাইয়া খেলাফত আসিন। এদিকে আব্বাসীয়দের হাতে তাড়া খেয়ে উমাইয়া রাজপুত্র আব্দুর রহমান জীবন বাঁচাতে স্পেনে গিয়ে উঠেছেন। সেখানে বিগত চল্লিশ বছর ধরে (৭১১ খৃষ্টাব্দ থেকে) চলে আসা মুসলিম সামরিক অভিযানের ফলশ্রুতিতে একটা ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই দ্বিতীয় আব্দুর রহমান সে খেলাফতটিকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। ইতিহাসে যেটাকে আন্দালুসিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

এশিয়ার বাইরে ইউরোপের বুকে এই খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল। ইউরোপ আর আফ্রিকার জনপদে ইসলামকে পৌছে দিতে এ খেলাফতটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, ইউরোপীয় রেনেঁসার সুত্রপাতই ঘটেছে এই আন্দালুসে চর্চিত হওয়া জ্ঞানের ওপরে ভিত্তি করে।

পরবর্তিতে আন্দালুস থেকেই আরও উত্তরের দিকে ক্রমে ক্রমে সরে গেছে দর্শনচর্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান আর গবেষণার ধারা। রজার বেকন (Rodger Becon) আর ইংল্যান্ডের এ্যাডালাড (Adelard of Bath) এ দু'জন সহ আরও বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় ছাত্র আন্দালুস থেকেই আলোকিত হয়ে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ দেশে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিলেন।

এদিকে এই ৭৫১ খৃষ্টাব্দেই বাগদাদে আব্বাসীয়রা আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। এ ঘটনাও ইসলাম ও মুসলমানদের এক ঐতিহাসিক অবস্থানে, তথা ইতিহাসের এক টার্নিং পয়েন্টে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সেটা তো পরবর্তিতে বিশ্ববাসী সকলেই জেনেছে।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, যে মূহুর্তে মুসলমানরা বাগদাদে একটা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করছে, যে মূহুর্তে আন্দালুসকে ইসলামের জ্ঞানে সাঁজাচ্ছে, জেরুজালেমকে দীর্ঘদিনের এক অস্থিতিশীল পরিবেশ থেকে মুক্ত করে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে শান্তি আর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করছে, সেই মূহুর্তে তাদের হাতে এসে পৌছুল কাগজ তৈরির প্রযুক্তি!

এটা ইতিহাসের পাতায় এক অসাধারণ ঘটনা। এর একটি বিষ্ময়কর ফল ঘটেছে। এক বিরাট জনপদ জুড়ে পুরো সমাজব্যবস্থা বদলে গেছে চীরদিনের জন্যই। আর তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব বদলেছে, বদলাচ্ছে এখনো।

যা হোক, চীনা যুদ্ধবন্দীর শেখানো পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি শুরু হলো সমরখন্দে। সাড়া পড়ে গেল পুরো মুসলিম বিশ্বজুড়ে। এর কারণ সুস্পষ্ট, তাদের হাতে জ্ঞানচর্চার প্রচুর উপাদান এসে জমা হয়েছে আর সেই সাথে রয়েছে আল কুরআন ও প্রিয় রাসুল সা: এর হাদিস।

সমরখন্দ থেকে বিস্ময়কর বস্তু(!) কাগজ ছড়িয়ে পড়লো সিরিয়া, দামেশক, বাগদাদ, জেরুজালেম ও কায়রোসহ প্রতিটি জনপদে। মুসলমানরা লুফে নিতে থাকলো। সিরিয়া ইয়েমেন, উত্তর আফ্রিকায় কাগজ তৈরির কল বসলো। স্পেনের জাটিভা (Jativa) শহরে তো বিশেষ ধরনের মোটা কাগজ উৎপাদন হতে শুরু হলো। ফলে বই বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে এক দারুণ গতিময়তা এলো।

এতোদিন সমরখন্দ থেকে আনা কাগজে চললেও চাহিদা বহুগুনে বেড়ে যাবার কারণে বাগদাদে অষ্টম শতাব্দির একেবারে শেষ দিকে (৭৯৫ খৃষ্টাব্দের দিকে) কাগজ তৈরির কল প্রতিষ্ঠিত হলো। বাগদাদের কাগজগুলো গুণে ও মানে হয়ে উঠলো আরও উন্নত, আরও আকর্ষণীয়। বাগদাদের 'সোউক আল ওয়ারেকিন' বা কাগজের বাজার অতি স্বল্প সময়েই দূর দুরান্ত থেকে বণিকদের টানা শুরু করলো। এটাই মুসলিম বিশ্বের প্রথম কাগজের বাজার।

বাগদাদ ততোদিন শৌর্যে বির্যে বিশ্বের বুকে একমাত্র কসমোপলিটন নগরী হয়ে গড়ে উঠতে শুরু করেছে কেবল। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে জ্ঞানী গুণী, পন্ডিতব্যক্তিরা বাগদাদে এসে ভীড় করতে শুরু করেছে। তারা নিয়োজিত হয়ে পড়লো জ্ঞান চর্চায়। আর কাগজ সহজলভ্য হবার কারণে তাদের চর্চিত সেই জ্ঞানগুলো পুস্তক আকারে বাঁধাই হতে শুরু করলো। এর ফলে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও বাগদাদ অতি দ্রুত বিশ্বের বুকে জায়গা করে নিল। একটা সময়ে এসে তা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রে রুপান্তরিত হয়ে পড়লো।

খৃষ্টবিশ্বের প্রাণকেন্দ্র, তৎকালিন বিশ্বের সুপার পাওয়ার বাইজান্টাইনে বাগদাদের কাগজকে বলা হতো 'Bagdatixon'। তাদের কাছে এটা ছিল এক মহার্ঘ বস্তু। মুখিয়ে থাকতো হাতে পাবার জন্য। রাজকীয় ফরমান আর সরকারি আদেশাদি, সমনপত্র ছাপাবার জন্য এক মোক্ষম বিলাসি উপাদান!

বলাই বাহুল্য, এই সময়টাতেই ফিক্বহ ও হাদিস শাস্ত্র ব্যাপকভাবে চর্চিত হওয়া শুরু হয়। এইসব চর্চার বাহ্যিক রুপ হলো নতুন নতুন বই-পত্র রচনা ও প্রকাশ। ফলে প্রায় প্রতিটি মুসলিম জনপদেই বই রচনা, ছাপা ও বাঁধাইয়ের সাথে একটা বিরাট জনগোষ্ঠী জড়িয়ে পড়লো। বইয়ের পাঠকও বহুগুনে বেড়ে গেল। প্রায় প্রতিটি জনপদেই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

বই হয়ে উঠলো খ্যাত বা অখ্যাত প্রতিটি মুসলমানের জীবনে এক অবিভাজ্য উপাদান। মুসলমান অথচ বই পড়বে না, মুসলমানের বাড়ি অথচ সেই বাড়িতে বইয়ের পাঠাগার থাকবে না, এমন অবস্থা কল্পনাও করা যেতো না সে সময়!

অবাক হবার কোন কারণ দেখি না, যখন দেখি প্রখ্যাত হাদিস গ্রন্থসমূহ সহিহ সিত্তার ছয়জন ইমামই এই মধ্য এশিয়া কিংবা পারস্য বা পশ্চিম এশিয়া থেকে বের হয়ে এসেছেন। একমাত্র ইমাম মালেক রহ: ই আরব। এর কারণও রয়েছে ঐ বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত।

বাগদাদের এই ধারা খুব সহজে এবং স্বল্পতম সময়ে ছড়িয়ে পড়লো আন্দালুসে। আন্দালুস আর বাগদাদ, এ দুটি কেন্দ্রে মোটমুটি কাছাকাছি সময়েই শুরু হলো প্রাচিন গ্রিক দর্শন আর মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা। এর ফল কী হয়েছে, সেটা লিখতে গেলে সম্ভবত একটা মহাকাব্যই লিখতে হবে।

অন্তত বলে রাখি যে, এই জ্ঞানই শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের হাতে পড়ে, যা ইউরোপব্যাপী প্রায় হাজার বছর ধরে চলা ইউরোপীয় রেনেসাঁর সুত্রপাত করে। ইউরোপ বদলে যায়, তারাই কালক্রমে বদলে দেয় মুসলিম বিশ্বকে, এমনকি, পুরো বিশ্বকেই।

যা হোক, জন্ম থেকে মৃত্যু অবদি জ্ঞানার্জন, জ্ঞানচর্চা আর জ্ঞানবিস্তারে বাধ্য মুসলমানদের মতো এক মিশনারী জাতির হাতে এইসব কেন্দ্রগুলো জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবার ফলে পরবর্তি কয়েকটা দশকের মধ্যে বিশ্বের বুকে এক বিস্ময়কর পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়।

একটা প্রশ্ন মনের ভেতরে সঙ্গত কারণেই বার বার উঁকি দিতে পারে প্রতিটি সচেতন ব্যক্তির। সেটা হলো, মুসলমানদের হাতে গ্রিস, সাইপ্রাস থেকে শুরু করে পারস্যের সমরখন্দ, বলখ, গজনী, ইস্পাহান, বুখারা, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, সিরিয়ার দামেশক

থেকে জেরুজালেম, মেসোপটেমিয়ার মসুল, বাগদাদ, দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন আর ইউরোপের গ্রানাডা, কর্ডোভা ও সেভিলসহ শত শত শহর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠেছে। এসব স্থানগুলো এর আগে ঠিক এভাবে কেন বিকশিত হতে পারে নি?

এর একমাত্র উত্তর হলো, যাদের হাতে এইসব অঞ্চল শাসিত হয়েছে, তাদের এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানের মাত্রা ও জ্ঞানচর্চার প্রতি তাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী। বাগদাদ কিংবা বুখারা, সমরখন্দ কিংবা সেভিল, দিল্লি বা দামেশক, কাবুল বা কায়রো, আন্দালুস বা জেরুজালেম, সবখানেই মানববসতি ছিল। তারপরেও সে সব জায়গাগুলো বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠতে পারেনি।

তবে এখন মুসলমানদের হাতে এইসব জনপদগুলো আসার পর থেকে সেখানে এক বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব। এটা হয়েছে বা হতে পেরেছে একমাত্র ইসলাম তথা মুসলমানদের জীবনদর্শনের কারণে।

একটা বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হলো, মুসলমানরা জ্ঞানচর্চায় আদিষ্ট। বিশ্বের বুকে তারাই একমাত্র জাতি, যারা জ্ঞানচর্চায় বাধ্য। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তারা জ্ঞানচর্চায় লেগে থাকতে বাধ্য। আর তার পাশাপাশি এই জ্ঞান বৃহত্তর মানব সমাজের কাছে পৌছে দিতেও তারা তাদের ধর্মীয় বোধ বিশ্বাস আর বিধিমালা অনুযায়ী বাধ্যবাধকতার মধ্যেই রয়েছে। এ কারণেই বিশ্বের বুকে মুসলমানরাই একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক মিশনারি জাতি: জ্ঞানের ফেরিওয়ালা।

আজকের বিশ্বে চারিদিকে যখন তাকাই, বিশেষ করে, মুসলিম দেশ ও সমাজের দিকে, তখন মনে প্রশ্ন জাগে, জ্ঞানের এই ফেরিওয়ালা জাতির সদস্যরা কি এই বাস্তবতাটুকু জানেন না?

উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
পিএইচডি গবেষক ও সিনিয়র এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে ছোট্ট সবুজ শ্যামল ভূখন্ডে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীন হওয়ার পর একে একে ৪৮টি বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড র‌্যাঙ্কিং তালিকায় শতকের মধ্যে স্থান করে নিতে পারেনি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো কম-বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার কারণে কিছুটা অগ্রগতি হলেও কাংখিত বা আন্তর্জাতিক মানে পৌছায়নি। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-গবেষণা ছাড়া কোন জাতি এগুতে পারে না। একুশ শতক বিশ্বায়নের যুগ, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে মূলত সেই দেশের উচ্চশিক্ষার মানের ওপর। বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগ শুরু হয়েছে, মানসম্মত গবেষণা ও বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে পিছিয়ে থাকলে অন্যের উৎপাদিত পণ্যের ফেরিওয়ালা হয়েই খুশি থাকতে হবে, তাই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রযুক্তি ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। বিশ্বায়নের এ যুগে গুণগত শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনা। শিক্ষাই যেহেতু একটি দেশের উন্নয়ন বা আধুনিকায়নের চাবিকাঠি সে কারণে এ ক্ষেত্রটি জাতির নিকট সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ।

কেমন চলছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এর হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১০৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, এর বাইরে আরো দু'চারটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশে সব মিলিয়ে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড়শতাধিক। নতুন জ্ঞান উৎপাদন ছাড়া এত বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী উপকার হবে? ইউজিসির ২০১৮ সালের হিসেব অনুযায়ী দেশের পাবলিক (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৩২১৮১৮২ জন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৩৬১৭৯২ জন এবং আন্তর্জাতিকসহ প্রায় ৩৭ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার যে চরম সংকট চলছে তা দিয়ে চাকরির বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন তরুন পাওয়া যাচ্ছে না। স্নাতক পাশ করে আসা চাকুরীপ্রার্থী সিংহভাগ তরুণ-তরুণীরা শুদ্ধভাবে দুই লাইন ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারেনা। এর সঙ্গে আছে যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনা ও আইটি দক্ষতার ঘাটতি। নিয়োগদাতারা বলছেন, প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ খুঁজে না পাওয়ায় তাঁরা ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কান নাগরিকদের নিয়োগ দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের কাছে চিরকালই বড় সাহেব ও চাকরি পাওয়া এবং মান-মর্যাদার ব্যাপার হিসেবে গণ্য। যে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার যোগ নেই, সেই শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অচল হয়ে যাবে, বাস্তবতাবর্জিত শিক্ষার পতন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। দেশীয় প্রেক্ষাপটে ক্রমান্বয়ে আমরা মৌলিক গবেষণা ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে অন্ত:সারশূন্য জাতিতে পরিণত হচ্ছি। আবার বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট খুবই কম ও সীমিত। গবেষণা ব্যয় বাজেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট বাজেটের ১.৫/২.১ শতাংশ। এই বরাদ্ধ দিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়, বড়জোর ছোট-খাটো পিকনিক করা যেতে পারে। বিশ্ব বাজারের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হচ্ছি পুরোনো ধাঁচের পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরুদের পাঠদান রীতি অনুকরণে শুধু পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়ানো নয়, কিংবা শ্রেণিকক্ষে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষকের কথা শোনা নয়। এ পদ্ধতি সম্পূর্নভাবে শিক্ষকনির্ভর হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। শিক্ষা ও গবেষণা খাতে অপ্রতুল বরাদ্ধ, সরকারের যথাপোযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার অভাব, গবেষণা বান্ধব উচ্চশিক্ষা কাঠামো ও পরিবেশ না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পর্যাপ্ত একাডেমিক ও মৌলিক গবেষণায় নেতৃত্বের আসনে না থাকায়, এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে এখন কার্যত

এগুলো ডিগ্রি ও সনদ উৎপাদন এবং বিক্রির কারখানায় পরিণত হয়েছে। তাই উচ্চশিক্ষায় প্রচলিত সনাতন পাঠদান ও মৌলিক গবেষণা পদ্ধতির পরিবর্তন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে।

মহাসঙ্কটে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান

মহাসঙ্কটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান, উচ্চশিক্ষার প্রবৃদ্ধি বাড়লেও দক্ষ জনবলের তীব্র সঙ্কট রয়েছে। মাছের পচন ধরে মাথায় আর জাতির পচন ধরে শিক্ষার মাধ্যমে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) তার ৪১ তম প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বসেছে। সর্বত্র সমালোচনা ও তিরস্কার নিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কী ভয়াবহ দুর্দিন এটা নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন চলে আসা অনিয়ম ছাড়াও অনৈতিক ও কলঙ্কজনক ঘটনা অহরহ ঘটছে এবং এটি ন্যক্কারজনক পর্যায়ে পৌঁছে তীব্র ইমেজ সঙ্কটের মুখে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ। ইউজিসি এর ৪৩তম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৬৫ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয় না। নতুন নতুন উদ্ভাবন বা গবেষণার বদলে পাঠ্যবই, লেকচার শিট, মুখস্থনির্ভর ও চাকরিকেন্দ্রিক পড়ালেখায় আবদ্ধ। এই ব্যতিক্রমী শৃঙ্খলাবিহীন বা নামমাত্র রিসার্চ পেপার দিয়ে অগ্রগতির হিসাব কষলে পিছিয়ে পড়া স্বাভাবিক নয় কি? উন্নতবিশ্বে প্রাথমিক স্তরেই পিএইচডি বিহীন শিক্ষক হতে পারে না। সেখানে আমরা পিএইচডিবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হওয়ার সুবন্দোবস্ত রেখেছি। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির অতিরিক্তপনা আছে, গবেষণায় ঘাটতি আছে, বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছেনা, বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় নাম তুলতে পারছে না। এগুলোর সার্বিক মানের অবনমন ঘটছে বলে একটি নেতিবাচক ধারনা ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ শিক্ষা-গবেষণা বিষয়ক সেমিনার ও সভা-সমাবেশে একেবারেই সাধারণ মানের পিছনের সারির ছাত্রদের মত নিভু নিভু মোমবাতির আলোর মত জ্বলে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের বিদেশে এমফিল, পিএইচডিসহ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা হলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ দেশের সম্পন্ন করা শিক্ষাজীবনকে কমিয়ে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে দেশের শিক্ষার্থীদের এমফিল, পিএইচডি গবেষণার মানও নেই, মূল্যও নেই। পুনরায় মাস্টার্স না করলে এমফিল, পিএইচডি করা যায় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেধাবী ছেলে-মেয়েরা যখন দেশের বাহিরে যায় তখন যদি নিজেদের সেরাটা দেখাতে পারে, তাহলে দেশের মধ্যে শিক্ষার্থীরা কেন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারবে না। শিক্ষার মান নিয়ে নাকানি-চুবানি ইতিমধ্যে আমরা দেখতে শুরু করেছি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার গুণগতমান নির্ধারণ ও নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক মানদন্ড আছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)। উচ্চশিক্ষার এই মানোন্নয়ন প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ সবাইকে সম্পৃক্ত করা মূলত: এই সেলের কাজ। এছাড়াও সিলেবাস, কোর্স কারিকুলাম ও কো-কারিকুলার এ্যাক্টিভিটিস সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ও শিক্ষা গ্রহণ প্রদ্ধতি কতটা মানসম্মত ও কর্যকরী হচ্ছে কি না, হলে গবেষণার গুণগতমান রক্ষা করা হচ্ছে কি না, দেশ বিদেশে মানসম্মত জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে কি না, তা যাচাই ও মূল্যায়ন করে রিপোর্ট দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার নিমিত্তে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত দায়িত্বপালন করছে কি না, সনদ ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের ডুকুমেন্টেশন সহ বহুবিধ কাজের তদারকি করবে এই সেল। যার প্রচলন আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় বিগত ৫/৭ বছর পূর্বেও ছিলনা, বর্তমানে চালু হলেও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অসহযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে সে ভাবে কার্যকর নয়। যদি এই আইকিউএসিকে সফল ভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়, তাহলে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী আন্তর্জাতিকীকরণ ও মানসম্মত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে স্বক্ষম হবে।

উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে অন্তরায় সমুহ

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার অভাব ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নানা অরাজকতার মাধ্যমে

একটি সুবিধাভোগী গ্রুপ তৈরী হয়ে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর দলদাসে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকটের সুযোগে গড়ে উঠছে গণরুম প্রবনতা, গেস্টরুম সংস্কৃতি। ফলে নিরীহ, অসহায় ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাবশালী রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের টর্চারসেল, মাস্তানী, নির্যাতন, নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অবরুদ্ধ করা সহ এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। যা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন মুক্তচিন্তা বিকাশের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু বর্তমানে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দাঙ্গাহাঙ্গামা, গুম-খুন, ছিনতাই-রাহাজানি অপহরণ, ধর্ষণ, ছাত্র-শিক্ষক হত্যা, টেন্ডারবাজি লুটসহ এমন কোন জঘণ্য সামাজিক অপরাধ নেই যা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সংঘটিত হচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষা ধসের ক্ষতিকর দিক ও করুণ চিত্র তালাশ করলে যে সমস্ত সমস্যা খুঁজে পাই তা হল:

১. অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা।
২. বিশ্বমানের সিলেবাস বা কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচির দুর্বলতা।
৩. সেশন জট ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণে ব্যর্থতা।
৪. ভর্তি ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটি।
৫. মানসম্মত ভালো পাঠ্য বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতা।
৬. মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগারের পাঠোপকরণ ও গবেষণাগারের অপার্যাপ্ততা।
৭. মেধার মূল্যায়নে পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবস্থায় দূর্বলতা।
৮. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের অসঙ্গতি।
৯. শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা।
১০. ছাত্র-শিক্ষক নির্বাচনে দলা-দলি, অস্বচ্ছতা ও রাজনীতির মন্দ প্রতিক্রিয়ার কারণে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য কেন্দ্রিক ক্যাম্পাস।
১১. দলীয় ও আত্মীয় করণের অভিশাপের ফলে বৈধ-অবৈধ উপায়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ, অথচ দক্ষ ও সৎ শিক্ষকের দারুণ অভাব।
১২. শিক্ষকদের অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা ও বেতন ভাতা।
১৩. উচ্চশিক্ষায় অর্থ সংকট ও গবেষণা খাতে অপর্যাপ্ত বরাদ্ধ।
১৪. শিক্ষাপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় ব্যাপক দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়।
১৫. শিক্ষক নিয়োগে মেধার পরিবর্তে রাজনীতি ও স্বজনপ্রীতি।
১৬. রাজনৈতিক সন্ত্রাস, খুন, বিচারহীনতার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয় অচল বা বন্ধ থাকা।
১৭. অধিকাংশ শিক্ষককের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির নলেজ না থাকা।
১৮. ডিগ্রী অর্জন বা সার্টিফিকেট মুখী শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে দৈন্যতা।
১৯. ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বির্বজিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও সহ শিক্ষার কুফলে অবাধ যৌনাচার।
২০. উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক অ্যাসিস্ট্যান্ট না থাকা।
২১. বছর শেষে শিক্ষককের মূল্যায়নের ব্যবস্থা অনুপস্থিতি।
২২. পরিপূর্ণ ও হালনাগাদ সিনেট সিন্ডিকিট না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ৭৩ সালের অর্ডিন্যান্সের অপব্যবহার করা সহ ইত্যাদি কারণে গুণগত মান তৈরীতে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

মানসম্মত উচ্চশিক্ষায় করণীয় কী?

উচ্চশিক্ষার সমস্যাটি হলো মানের, গুণের, মেধার, চিন্তার, যা শিক্ষার কোনস্তরেই নিশ্চিত করা যায়নি। আমরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলছি। শিক্ষার জোয়ারে ও বন্যায় দেশ আজ ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা কী শিক্ষা পেলেন, এই শিক্ষা নিয়ে কর্মজীবনে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন কি না? সেসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা আগেও ছিল না এখনো নেই। বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান চর্চার জায়গা। এখানে যুক্তি, তর্ক ও গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন আবিষ্কার বেরিয়ে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতিকে স্বপ্ন দেখাবে পথের দিশা দেবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় রাজনীতি চর্চায় যতটা সক্রিয় জ্ঞান চর্চায় ততটা উদাসীন ফলে শিক্ষার পরিবেশ ক্রমান্বয়ে কলুষিত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টি বছরের পর বছর উপেক্ষিত হওয়ায় পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। ভর্তি ও পাশের হার বাড়লেও সঙ্কটে আছে শিক্ষার মান। আমাদের উচ্চশিক্ষার মান অনেকখানি পড়ে গেছে এবং সম্ভবত এটি ক্রমাগত নিম্নমুখী। উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষা সীমিত তাই কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প কারিগরি শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে বিশাল মানবসম্পদকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করা। শিক্ষিত লোকেরাই প্রতিটি দেশের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে আসীন থাকেন, এ কারণে একটি

দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৎ না হলে ঐ দেশের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বছরে পর বছর ছাত্রছাত্রীদের পাস করাবে না বরং সমাজের প্রতি সামাজিক উন্নয়নে তাদের কিছু দায়বদ্ধতা অবশ্যই থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে এমন একটি সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্র যেখানে মানবতার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হবে এবং তার সঠিক সমাধান খুঁজে বের করা হবে। শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভবিষ্যৎ ও নতুন প্রজন্মকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি দিয়ে মাথা ভর্তি করে দিলেই হবেনা। তাদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ভাল মানুষ তৈরী করতে হবে। সততা, নিষ্ঠা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নিবেদিতপ্রাণ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও ধারণা করা হচ্ছে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ স্বয়ংক্রিয়তা, রোবট, ইন্টারনেট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে ৮০ কোটি মানুষের কাজ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে, নতুন ১০০ কোটি মানুষের কাজও সৃষ্টি হবে, তবে সেগুলোতে শ্রমের চেয়ে মেধার প্রাধান্য থাকবে বেশী। বিষয়টি মাথায় রেখে মানসম্মত গবেষণা ও শিক্ষা অর্জনে বিশ্বব্যাপী জাতিগুলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে। এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নজর দিতে হবে। অন্যথায় কোন পরিবর্তন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং নিয়ে নানামুখী সংকট, প্রয়োজন গভীর উপলব্ধি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চলছে না একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বায়নের ব্যাপার থাকে। যেখানে বিদেশী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী থাকবে, মাল্টিকালচারাল ব্যবস্থা থাকবে, শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও প্রকাশনা থাকবে। বর্তমানে বিসিএস নির্ভর পড়াশুনা গবেষণার অন্যতম অন্তরায়। বিসিএস চাকুরেদের সুযোগ-সুবিধার ছিটেফোঁটাও নেই, গবেষণা বিষয়ক চাকুরিতে। আবার ছাত্র-শিক্ষকদের যোগ্যতার পরিবর্তে রাজনৈতিক পরিচয়ে চাকুরি ও পদ-পদবী মিলে। রাজনীতি ও গবেষণা দুটার জন্যই সময় দিতে হয়। তাই এই দুটো একসাথে চলে না। তাঁরা যদি দেখেন রাজনীতি করলে বিভিন্ন পদ-পদবী পাওয়া যায় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। আর উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় একজন প্রফেসর হওয়ার পর তাঁর আর কোন প্রমোশন বা আর্থিক সুবিধা নেই। তাহলে কেন তাঁরা রাত জেগে না ঘুমিয়ে কষ্ট করে গবেষণার পিছনে এত সময় ব্যয় করবেন। একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশনা উপযোগী আর্টিকেল লিখতে হলে কমপক্ষে ৪০০ থেকে ৫০০ কর্মঘন্টা বা তার চেয়েও অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। তাহলে কেন তাঁরা গবেষণার মত এত কষ্টের কাজে মনোযোগী হবেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সেকেলের অগোছালো নৈতিকতা বর্জিত শিক্ষা পদ্ধতি ও গবেষণাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যায়নে পিছিয়ে পড়েছি আমরা। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে উচ্চশিক্ষার মানের দিক দিয়ে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ২৯তম ও ৪০তম। এটি সত্যিই উদ্বেগজনক চিত্র। শিক্ষার মানের চিত্রটা আসলে কী, এ প্রশ্নে উদ্বিগ্ন দেশের জনগণ, শিক্ষাবিদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা, এমনকি খোদ শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারপ্রধানও। অধিকাংশের ধারণা হচ্ছে, শিক্ষায় সংখ্যাগত বিস্তৃতি ঘটলেও প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার মানে বিরাজ করছে অরাজকতা। শিক্ষার মান বিচারে এশিয়ার সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। আর বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের অবস্থা তলানিতে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে কেরানি বানানো কিংবা পাকিস্তান আমলে আমলা তৈরীর যে শিক্ষা ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে তারই অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণ যুগ যুগ ধরে চলছে। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বিশ্ব বা এশিয়া ভিত্তিক বেশকিছু সংস্থা ৪০০/৫০০ মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং বা ক্রমতালিকা প্রকাশ করলেও বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সেই তালিকায় স্থান হয় না। কেন আমরা র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে আছি। কীভাবে র‍্যাঙ্কিং করা হয়, র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার উপায়ই বা কী ? এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর বা কৈফিয়ত খুঁজতে হলে খুব গভীরে যেতে হবে, তবে একটি কথা অব্যশই বলা যায় যে নিশ্চয় সংস্থাগুলো কিছু সুনিদিষ্ট পদ্ধতি বা সূত্র ব্যবহার করে এই র‍্যাঙ্কিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এই র‍্যাঙ্কিং ফর্মুলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে আলোচনা করা হল। যথা:

১. পাঠদান ও শিক্ষা গ্রহণ প্রদ্ধতি কতটা মানসম্মত ও কার্যকরী।
২. সিলেবাস, কোর্স কারিকুলাম ও কো-কারিকুলার এ্যাক্টিভিটিস কীভাবে হয়।
৩. শিক্ষকদের যোগ্যতা, ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপাত কি রকম, ক্লাস আওয়ার কতটুকু বিবেচনায় আনা হয়।
৪. এমফিল, পিএইচডি কোথা থেকে করা হল তার বিষয়বস্তু কী ও ডিগ্রীধারী শিক্ষক-কর্মকর্তার সংখ্যা, কর্মক্ষেত্র সাফল্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান ও গবেষণাগুলোর সাইটেশন কেমন।
৫. গবেষণাকর্মের বানিজ্যিকীকরণ ও এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য ও বার্ষিক আয়ের পরিমান।
৬. আন্তর্জাতিক উপস্থিতি (ছাত্র-শিক্ষক), জ্ঞান আদান-প্রদান ও বিনিময়ের হার।
৭. সুনাম ও পরিচিতি জরিপের রেপুটেশন সার্ভে।
৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের পরিমান, এক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা বাজেটের অনুপাত কত।
৯. আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা আর্টিকেল প্রকাশনার পরিমান কত? এবং শিক্ষক ও গবেষকদের মাথা পিছু প্রকাশনা কয়টি।
১০. শিক্ষার পরিবেশ বান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থা আছে কি না, গ্রন্থাগারে পাঠ উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা কেমন রয়েছে।
১১. অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্যসমৃদ্ধ ভালো কার্যকর ওয়েবসাইট শতভাগ আপডেট করা হয় কি না।

আর এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া বা শর্তগুলো পালনে বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হয়তো ধারে কাছেও নেই। যার কারণে ওয়ার্ড র‍্যাঙ্কিং থেকে ছিটকে পড়েছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কাঠামো। সব হিসেব কষে কী মনে হচ্ছে? আমরা কি আদৌও এইসব র‍্যাঙ্কিং ধারে কাছে যাওয়ার যোগ্যতা রাখি? মোটেও না। কিন্তু এর কোন বিচারেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উত্তীর্ণ হবে না। তাই নিজেদের মর্যাদা নিজেরাই হারাচ্ছি, যার ভবিষ্যৎ রূপরেখা হবে ভয়াবহ।

উচ্চশিক্ষা মান নিয়ে জাতির প্রত্যাশা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞান সৃষ্টি করা (To create knowledge)। যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি করা হয় না, তাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না। কথায় আছে, বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়। ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কেমন হবে সেটি তার গবেষণা পরিচয় দিবে। জ্ঞান নির্ভর তথ্য-প্রযুক্তি ও উন্নত অর্থনীতির যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির সাদামাটা পাঠদান ও সনদ প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই। জাতির প্রত্যাশা হলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উচ্চশিক্ষার গুণগতমানে সকল শঙ্কা, দৈন্যতা, নেতিবাচক ধারণা ও ইমেজ সঙ্কট কাটিয়ে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং তালিকা থেকে ছিটকে না পড়ে বাংলাদেশের অন্তত দু'চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং তালিকায় শতকের মধ্যে স্থান করে নিবে। তাই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়বদ্ধতা হলো নিরলস জ্ঞানচর্চা, অর্জিত জ্ঞান অধ্যয়ন, বিতরণ, নিত্য-নতুন বহুমুখী গবেষণার ভেতর দিয়ে আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ই-সার্ভিস ও ডিজিটালাইজেশনসহ জ্ঞানের অনুসন্ধান ও ক্রমসম্প্রসারণ করে সমাজ ও জাতিকে কর্মচঞ্চল জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা। একটি দেশ কখন বড় হয়? যখন দেশটি শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যায়। যে শিক্ষা যুগের চাহিদা মেটায়, অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করে, মানবিক বোধের বিকাশ ঘটায়, নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়ে একটি সুদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী করে। তাই দ্রুততম সময়ে সবকিছুর লাগাম টেনে ধরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী।

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী
প্রো-ভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

সূচনা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ১৪'শ বছর পূর্বে অহির মাধ্যমে নাযিলকৃত মানবজাতির জন্য পথের দিশা সম্বলিত আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এই কিতাব পূর্বের নবী, রাসূল এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের স্বীকৃতির এক প্রামাণ্য দলিলও বটে। মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনার পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অসংখ্য তথ্য রয়েছে এ মহাগ্রন্থে। এই গ্রন্থে রয়েছে অতীত সভ্যতার ঘটনাবলী এবং দিক-নির্দেশনা, যা মানব জাতি জানত না এবং দিক-নির্দেশনা ও তথ্যাবলী আছে ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের এবং তারপরেরও এক অনন্ত মহাকালের যা মানুষের চিন্তার অতীত।

পৃথিবী পৃষ্ঠের ৪ ভাগের ৩ ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে পানি। এই পানির বিরাট অংশ দখল করে আছে সাগর ও মহাসাগর। এই সাগর শব্দটি পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ২৫টি সূরায় ৪০ বার এসেছে। পাঠকের পড়ার সুবিধার জন্য এখানে ঐসব সূরা এবং আয়াতসমূহের ক্রমিক নম্বরগুলো উল্লেখ করা হলো:

২:৫০, ১৬৪; ৫:৯৬, ১০৩; ৬:৫৯, ৬৩, ৯৭; ৭:১৩৮, ১৬৩; ১০:২২, ৯০; ১৪:৩২; ১৬:১৪; ১৭:৬৬, ৬৭, ৭০; ১৮:৬০, ৬১, ৬৩, ৭৯, ১০৯; ২০:৭৭; ২২:৬৫; ২৪:৪০; ২৫:৫৩; ২৬:৬৩; ২৭:৬১, ৬৩; ৩০:৪১; ৩১:২৭, ৩১; ৩৫:১২; ৪২:৩২; ৪৪:২৪; ৪৫:১২; ৫২:৬; ৫৫:১৯, ২৪; ৮১:৬; ৮২:৩।

কুরআনে বর্ণিত এইসব বক্তব্য বুঝতে হলে বিজ্ঞানধর্মী জ্ঞানেরএকান্ত প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে কুরআনে বর্ণিত সাগর সম্পর্কে অনেক আয়াত থেকে মাত্র দু'টি আয়াতের আলোচনা করা হলো। প্রথম অংশে আলোচনায় রয়েছে সাগরের স্তরীভূত অন্ধকার (২৪:৪০) এবং দ্বিতীয় অংশে আলোচনায় রয়েছে দুই পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগকারী দুই সাগরের মিলন তথ্য নিয়ে (৫৫:১৭-২৫, ২৫:৫৩)।

সাগরের গভীর থেকে গভীরতায় বিভিন্ন রংয়ের শোষণ, আলোর প্রস্থান এবং অন্ধকারের আবির্ভাব কীভাবে?

মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ। মানবজাতি এবং জ্বীনদের পক্ষে এই কুরআনের মত একটি সূরাও রচনা করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের বহু জায়গায় এই নিয়ে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ১৪'শ বছর ধরে এই চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে পারেনি এবং কোন দিন পারবেও না। কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরদিনের এবং পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে এর অলৌকিকত্ব বিভিন্ন সময়ের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত হতে থাকবে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি

গভীর সাগর-মহাসাগরের গভীরতা এবং তার বৈশিষ্ট্যাবলী। পবিত্র কুরআনের ২৪নং সূরা নূরের ৪০নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, "অথবা (অবিশ্বাসীদের অবস্থা) মহাগভীর সমুদ্র তলের অন্ধকারের মতো, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, গাঢ় অন্ধকার স্তরের উপর স্তর, যদি একজন মানুষ হাত বাড়ায় তা আদৌ সে দেখতে পাবে না, আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না তার জন্য কোন আলো নেই"।

কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটির মেরিন জিওলজির বিশেষজ্ঞ প্রফেসর দূর্গা রাও (Professor Durga Rao) কে বিজ্ঞান বিষয়ক কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে উপরের আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা সাবমেরিনের সাহায্যে বর্তমানে সাগরের তলদেশের অন্ধকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছে এবং গভীর সাগরে ডুব দিয়ে থাকতে সক্ষম হয়েছে। যারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তার জন্য ঝিনুক কুড়ায় তারা শুধু কম গভীরতায় (২০-৩০ মিটার) ঐ কাজ করতে পারে মানুষ সমুদ্রের ২০০ মিটার গভীরতার অন্ধকার অংশে বাঁচতে পারে না। উপরের বর্ণিত আয়াত গভীর সমুদ্রের একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। শুধুমাত্র গভীর মহাসমুদ্রে ঐ রকম স্তরীভূত অন্ধকার সৃষ্টি হওয়ার পিছনে দু'টি কারণ অন্তর্র্নিহিত আছে।

প্রথম কারণ: আলোক রশ্মি সাতটি রংয়ের (VIBGYOR) সমন্বয়ে গঠিত। যখনি আলোক রশ্মি পানিতে এসে পড়ে তখন তা সাতটি রংয়ে বিন্যাস্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে শোষিত হয়ে সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। প্রথম উপরিস্তরের ১০ মিটারে লাল রং শোষিত হয়। কোন ডুবুরী সমুদ্র পৃষ্ঠের উপরি ভাগের ৩০মিটার গভীরে যদি কোন আঘাত পেয়ে শরীর থেকে রক্ত বের হয় তা সে দেখতে পাবে না। কারণ ঐ গভীরতায় আলোর লাল রং পৌঁছায় না। ঐ ভাবে দেখা যায় পরবর্তী গভীরতায় (৩০-৫০ মিটার) কমলা রং শোষিত হয়ে যায়। ৫০-১০০ মিটার গভীরতায় হলুদ রং শোষিত হয়। ১০০-২০০ মিটার গভীরতায় সবুজ রং এবং ২০০ মিটার এর বাইরে গভীরতায় নীল রং শোষিত হয়। বেগুনী এবং ইনডিগো ২০০ মিটার উপরে শোষিত হয়। এভাবে একের পর এক সব রং শোষিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সাগরের এক এক স্তরে এক এক রং শোষিত হওয়ার ফলে স্তরীভূত অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং তলার দিকে অন্ধকার ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে সব শেষে কঠিন অন্ধকার আবির্ভূত হয়। ১০০০ মিটারের নিচে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

দ্বিতীয় কারণ: বাঁধা প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আলো লুকিয়ে যায়, ফলে অন্ধকার ঘনীভূত হয়। আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে যে আলোক রশ্মি দেখি তার উৎস হলো সূর্য। আকাশে মেঘ থাকলে এই আলোক রশ্মি প্রথম মেঘে বাঁধা প্রাপ্ত হয়। কারণ মেঘের মধ্যে পানির বিন্দুতে আলো শোষিত হয় এবং কিছু আলোক রশ্মিতে বিন্যস্ত হয়। যার ফলে মেঘের নিচে অন্ধকার স্তরের সৃষ্টি হয়। তা হলো অন্ধকারের প্রথম স্তর। আলোক রশ্মি যখন সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে পতিত হয় তখন তা সমুদ্রের ঢেউয়ের কারণে প্রতিফলিত হয়ে উজ্জলতা প্রদর্শন করে। উজ্জলতার প্রতিফলনের মাত্রা ঢেউয়ের কোণের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। ফলে তরঙ্গসমূহ আলোকে প্রতিফলিত করে উপরে নিক্ষেপ করার ফলে নিচে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের গভীরে কেবল অপ্রতিফলিত রশ্মিসমূহ প্রবেশ করে। এভাবে সমুদ্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়– আলো ও গরম তাপমাত্রা সম্পন্ন উপরিভাগ এবং অন্ধকারসম্পন্ন গভীর স্তরসমূহ। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এই দু'স্তর এক অন্যের থেকে পৃথক এবং উপরিভাগ তরঙ্গের মাধ্যমে গভীর স্তর থেকে পুনরায় পৃথক।

সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালা ও অন্ধকারের স্বরূপ: সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালা সবেমাত্র ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে যে সমুদ্রের গভীরেও তরঙ্গ রয়েছে, যা ঘন ইন্টারফেসের উপর বিভিন্ন ঘনত্বের তরঙ্গের মধ্যে সংঘটিত হয়। অভ্যন্তরীণ তরঙ্গসমূহ সাগর এবং মহাসাগরের গভীর অংশকে দখল করে থাকে। কারণ গভীর অংশের পানি অধিকতর ঘনত্ব সম্পন্ন। উপরিভাগের ঢেউয়ের মত এগুলো ভাঙ্গতে পারে। অভ্যন্তরীণ তরঙ্গমালা মানুষের চোখে দেখা যায় না। কিন্তু গভীরতার নির্দিষ্ট অবস্থানের তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঐ সব তরঙ্গ সনাক্ত করা যায়। সমুদ্রের দুই স্তর পৃথককারী ঐ সব তরঙ্গের নিচ থেকে অন্ধকার শুরু হয়। এই সমস্ত গভীর অঞ্চলে

বসবাসকারী মাছও কিছু দেখতে পায় না। ঐ স্তরে (মাছের) তাদের শরীরের নিজস্ব আলোক অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে তারা পথ চলে। একের উপর আরেক স্তরীভূত অন্ধকার সম্পর্কে কুরআন বলছে- "গভীর মহাসমুদ্র অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয় বিশাল তরঙ্গের নিচে তরঙ্গ দ্বারা।"(২৪:৪০)

ঐ সব তরঙ্গের উপর আরও সমান্তরাল অন্ধকার স্তর আছে। এই অন্ধকার স্তরগুলি সমুদ্র সারফেসের উপর স্থান লাভ করেছে। কুরআন আমাদেরকে ঐ অন্ধকার সম্পর্কে জানাচ্ছে,"যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ; গাঢ় অন্ধকার স্তরের উপর স্তর।" (২৪:৪০)

সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে আলোক রশ্মির বিভিন্ন রং শোষিত হওয়ার পর যে অন্ধকার সৃষ্টি হয় তার অতিরিক্ত মেঘের নিচে এই অন্ধকার। সমুদ্রের বিশাল গভীর অন্ধকারের অবস্থা বুঝতে গিয়ে কুরআন বলছে,"(ঐ গভীরতায়) যদি একজন মানুষ হাত বাড়ায় সে ঐ হাত আদৌ দেখতে পারে না (অর্থাৎ অতি নিকটতর বস্তু)। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না তার জন্যে কোন আলো নেই।" (২৪:৪০)

এই স্তর হলো সম্পূর্ণ অন্ধকার স্তর। এই জন্যেই গভীর সমুদ্রের তলদেশে সাবমেরিনকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব আলো সঙ্গে নিতে হয়।

আল-কুরআনের উৎস কোথায়?

হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সাগরের গভীরতার এসব স্তরীভূত অন্ধকারের খবর কে দিলেন? ১৪'শ বছর আগে আধুনিক বিজ্ঞানের এই জ্ঞান তিনি জানলেন কেমন করে? পবিত্র কুরআনে এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য পৌঁছাল কী করে? এসব প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর রাও বলেন, ১৪'শ বছর আগে আধুনিক বিজ্ঞানের এসব তথ্যের উপস্থিতি ছিল, এটা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। তখনকার মানুষের সহজ সরল ধারণা ছিল, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। একজন সাধারণ মানুষ সাগরের গভীরে অন্ধকার সংঘঠিত হওয়ার ক্রিয়াকলাপ প্রপঞ্চের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সুতরাং আমি (প্রফেসর রাও) মনে করি যে এ সব তথ্য একটি সুপার ন্যাচারাল উৎস থেকে এসেছে। হ্যাঁ, এই জ্ঞানের উৎস মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

প্রফেসর রাও যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, এটি এমন একটি ব্যাপার যা প্রাকৃতিকভাবে কোন জীবের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এটি সত্যিকার অর্থে তাঁরই বক্তব্য যিনি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রকৃতিকে জানেন, জানেন মহাবিশ্ব এবং তার গোপন বিষয়াদি। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক কুরআনে আমাদেরকে জানাচ্ছেন?, "বল, ইহা তিনি অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন নিশ্চয়: তিনি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (২৫:৬)

শান্তি কোন পথে?

উপরে বর্ণিত গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ, আলো-অন্ধকারের জ্ঞান ও তথ্যাদি পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে দিয়ে কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহগ্রন্থ আল কুরআন শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের বই নয়। এ গ্রন্থে রয়েছে মানবকুলের পথ নির্দেশ। ১৪'শ বছর পূর্বের এই গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত এসব তথ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এক একটি উক্তি এটাই প্রমাণ করছে যে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞান এবং 'মানবকুলের পথ নির্দেশ' এক অবিসংবাধিত নিখুঁত সত্য। যে পথ নির্দেশ নবীজীর (স:) মাধ্যমে সমাজে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ইতিহাসের জঘন্যতম ভয়াবহ আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর হয়ে গিয়েছিল। আর কেবল এই নিখুঁত সত্য পথ-নির্দেশই (আল-কুরআন),শান্তি দিতে পারে বর্তমান বিশ্বের অন্ধকারে নিমজ্জিত, মনগড়া নিয়ম-কানুন তথা মতবাদে আবিষ্ট, সন্ত্রাসের দাবানলে পিষ্ঠ, ক্ষুধায় অনাহরে জর্জরিত, পরকালকে ভুলে ক্ষমতার লোভে পাগলপারা, সঠিক জ্ঞানের আলোবিহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবকুলকে।

এবারের আলোচনা দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম নিয়ে।

দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম কী? কীভাবে সুয়েজ খাল দুই সাগরকে সংযোগ করল?

এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় আলোচনা হচ্ছে দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের সংযোগকারী দুই সাগর বা দরিয়া নিয়ে। এই দুই দরিয়া হলো ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর। আর সংযোগকারী খালটি হলো 'সুয়েজ ক্যানেল'। দুই পূর্ব হল (১) মধ্যপ্রাচ্য (Middle East) এবং (২) নিকট প্রাচ্য (Near East)। আর দুই পশ্চিম হলো (১) পশ্চিম ইউরোপ (Western Europe) এবং (২) পূর্বাঞ্চলীয় ইউরোপ (Eastern Europe)। দু'টোই কিন্তু দুই পশ্চিমের ইউরোপ।*

* কুরআন শরীফের বিভিন্ন অনুবাদে এই দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমকে গ্রীষ্ম এবং শীতকালে যথাক্রমে সূর্যের দুই উদয়াচল এবং অস্তাচলকেও অভিহিত করে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সুয়েজ খালের দৈর্ঘ্য ১০১ মাইল। পরবর্তীতে সংস্কারের মাধ্যমে ২০১৫ সালে খালটির দৈর্ঘ্য ১২০ মাইলে (১৯৩ কি.মি.) উত্তীর্ণ হয়েছে। গভীরতা হয়েছে ২৪ মিটার, আর প্রস্থ হয়েছে ২০৫ মিটার। যার ফলে খালটিতে টু-ওয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ কনটেইনার শীপ OOCL-Hong Kong (৪০০ মিটার দৈর্ঘ্য) ২১৪০০ কনটেইনার নিয়ে ২০১৭ সালে সুয়েজ খাল অতিক্রম করেছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে ছোট খালটি নিয়ে মানব ইতিহাসে যত হৈচৈ হয়েছে অত হৈচৈ আর কোন খালকে নিয়ে হয়েছে বলে ইতিহাসে রেকর্ড নেই। অর্থনৈতিকভাবে এই খাল দখল করে আছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গুরুত্ব পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, স্বল্প সময়ের মধ্যে এই খাল তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ইউরোপের সংযোগ সাধন করেছে। এশিয়ার লোকজন তাদের শিল্পায়নের জন্য ইউরোপের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং স্বল্প সময়ে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে ভারী মালামাল সরবরাহের জন্য এই খালের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুয়েজ খালের দুই প্রান্তে অবস্থিত লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগর হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা এবং প্রবাল। লোহিত সাগর মুক্তা শিল্পের জন্য পৃথিবী খ্যাত। ফার্সী এবং উর্দু প্রবাদে আছে, Durr-i-adani এবং Arabic 'Durr' Adan (The pearl of Aden) অর্থাৎ এডেনের প্রসিদ্ধ মুক্তার দিকে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ভূমধ্যসাগর হলো অত্যন্ত দামী ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ লাল প্রবালের (Red Coral) নিবাস। এগুলো আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, সার্দিনিয়ান, সিসিলিয়ান এবং ব্যালোরিয়ারিক দ্বীপগুলোতে পাওয়া যায়। ন্যাপলসের কাছে সিসীলীর Sciacea-তে প্রচুর প্রবাল উৎপাদন হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, রাশিয়া, জাপান এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমধ্যসাগরের হাল্কা গোলাপী প্রবাল খুব উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়।

উপরিউক্ত দুই দরিয়া (ভূ-মধ্যসাগর ও লোহিত সাগর) সনাক্ত করার পর উভয়ের মাঝে বাঁধার স্থান নির্ণয় করতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। আর তা হলো সংকীর্ণ ইসতমাস (Narrow Isthmus), যা এই দুই দরিয়ার মাঝে যুগ যুগ করে বাঁধা হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তা সুয়েজ নামে পরিচিত। এই বাঁধা সম্পর্কে কুরআন বলেছে একদিন এই বাঁধা দূরীভূত হবে এবং দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের মাঝে দুই দরিয়ার মাধ্যমে পর্বত সদৃশ জাহাজ দ্বারা বানিজ্যের প্রবাহ চলবে। চৌদ্দশত বছর পূর্বে বহুতল বিশিষ্ট পর্বত সদৃশ যান্ত্রিক প্রপেলার জাহাজের কথা চিন্তা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সম্ভব হয়েছে এমন এক কিতাবে যার নাম 'আল কুরআন' এবং যিনি তা উচ্চারণ করেছেন তিনি হলেন আরবে জন্ম গ্রহণকারী উম্মি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। পবিত্র কুরআনের ৫৫নং সূরা আর-রহমানের ১৭-২৪নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন,

১৭. (তিনিই) দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের? প্রভু। (Lord of the two Easts and Lord of the two Wests.)

১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে (জ্বীন এবং মানব) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়। (He [Lord] has let free the two seas (two bodies of flowing walk) meeting together.)

২০. এ দুটির মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, তারা একের উপর আর এক আপতিত হয় না। (Between them is a Barrier, which none of them can transgress) [they not rush on each other.]

২১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

২২. এদের মধ্য হতে (দুই দরিয়া হতে) উৎপন্ন হয় মুক্তা এবং প্রবাল। [Out of them come pearls (Lu Lu) and Corals (Marjan)]

২৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

২৪. এবং এই সমুদ্রে যাওয়া আসা বড় পর্বত সদৃশ জাহাজগুলো তাঁরই। (And his are the ships going and coming in the seas, Like mountains)

কুরআনের আরেক সূরায় (১৮:৬০) হযরত মুসা (আ) এর একটি ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর সঙ্গীকে বলেছিল, দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো?"

এই দুই সমুদ্র হলো সিনাই উপত্যকায় আকাবা উপসাগর এবং সুয়েজের মিলনস্থল (two arms of the

Red sea join together, viz; the Gulf of Aqabah and the Gulf of Suez, they enclose the Sinai Peninsula) এবং কুরআনের আর এক সূরায় (২৫:৫৩) আল্লাহ পাক বলেন, "এবং ইহা তিনিই যিনি দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয়, মিষ্ট এবং অপরটি লোনা এবং দুঃসহ এবং উভয়ের মধ্যে তৈরি করেছেন এক অন্তরাল, এবং এক নিষেধ দেয়াল (অনতিক্রম্য)।" সুয়েজ খাল Shortcut রুট (৭৫ মাইল) ব্যবহার করে না। চলার পথে উত্তর থেকে দক্ষিণে অধিকন্তু অনেকগুলো হ্রদ ব্যবহার করে। যেমন হ্রদ Manzala, হ্রদ Timsah, Grent Bitter Lake এবং Little Bitter Lake। ইহা ওপেন কাট এবং Lock বিহীন খাল। পানামার মত Lock এখানে নাই।

উপরে বর্ণিত সূরা আর রহমানের (৫৫:২০) يبغين শব্দটি অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ। এর মূল অর্থ হলো আপতিত হবে না। অর্থাৎ দুই সাগর একে অপরের উপর আপতিত হবে না। সহজ অর্থে এখানে এটাই বোঝাচ্ছে যে এক দরিয়া আর এক দরিয়ার উপর উচ্চতার হেরফেরের জন্য অস্বাভাবিকভাবে পড়বে না।

সুয়েজ খাল খনন, ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর সংযোগের চাঞ্চল্যকর তথ্য এবং কুরআনের ইঙ্গিত:

ইতিহাসের পাতায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে প্রাচীনকাল থেকে এই দুই দরিয়া (ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর) সংযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই কাজ সম্পন্ন করলে দুই দরিয়ার (লোহিত সাগর: পূর্বাঞ্চলীয় ভূমধ্যসাগর থেকে ১.২ মিটার বা ৪ ফুট উচ্চতর) উচ্চতার হেরফেরের জন্যে অস্বাভাবিক পানির স্রোতের প্রবাহমান ধারায় এশিয়া বা ইউরোপ পানিতে তলিয়ে যাবে এই ভয়ে করা হচ্ছিল না। কিন্তু কুরআন জানিয়ে দিচ্ছে,"হে মানুষ, এই দুই দরিয়া একটির উপর আরেকটি অপতিত হবে না।"

এই দুই দরিয়া মিলনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মিশরের অধিপতি ফেরআউনের মাথায়ও এই দুই দরিয়া সংযোগের চিন্তা ছিল। তখন মিশর কারিগরী জ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল। আজকের পিরামিড তার সাক্ষী। ফেরআউনও নেপোলিয়ানের মত এই ধারণা বাতিল করে যখন তাদের প্রকৌশলী অভিমত দিলেন, অত্যন্ত ভয়াবহ বিপদ সংঘটিত হবে যখন উচ্চ লেভেলের (লোহিত সাগর) সংযোগ হবে নিম্ন লেভেলের (ভূমধ্যসাগর) সাগরের সাথে। তথাপি প্রাচীন মিশরীয় রেকর্ডে দেখা যায়, সম্ভবত দ্বিতীয় রামসাস কর্তৃক একটি খাল খনন করা হয়েছিল যা নীল ডেল্টাকে লোহিত সাগরের সাথে সংযোগ করেছিল। এ ধরণের একটি খাল ১৩৮০ খ্রিষ্টপূর্বে ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এটি পরবর্তীতে দৃশ্যত ব্লক হয়ে যায়। আরো পরে প্রায় ৫২০ খ্রিষ্ট পূর্বে পারস্যের রাজা Darius-ও এটি পুনরায় খনন করেন। রোমান সময়ে এটার কিছু মেরামত হয়েছিল। কিন্তু খালটি সার্বিকভাবে মেরামত এবং পরিষ্কার করে নৌ চলাচলের জন্য যিনি উপযোগী করে তোলেন তিনি হলেন মিশর বিজয়ী এক আরব সেনাপতি আমর ইবনে আস (৬৪১ বা ৬৪২ খৃষ্টাব্দ)। বর্তমান সুয়েজ খাল তৈরির সময় পুরাতন খালের কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছিল মিষ্টি পানির খাল তৈরিতে।

বর্তমানের ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের প্রকল্প প্রায় পনের শতাব্দী থেকে বিবেচনায় ছিল। কিন্তু ১৭৯৮ সালেই এর ব্যবহারিক দিক বুঝা যায়, যখন নেপোলিয়ান তার ইঞ্জিনিয়ার Lepere-কে তলব করে সম্ভাব্যতা যাচাই করে একটি রিপোর্ট দিতে বলেন। Lepere জরিপের পর মন্তব্য করেন, ভূমধ্যসাগর লোহিত সাগর থেকে ৩৩ ফুট নিচে (১০ মি.)। পরবর্তীতে Lepere'র ভুল ধরা পড়ে। ফ্রান্সের কুটনৈতিক de Lesseps ১৮৪৯ সালে এই সমস্যা নিয়ে কাজ করেন এবং সুয়েজ খাল তৈরির জন্য ১৮৫৪ এবং ১৮৫৬ সালে তিনি মিশরের শাসক সায়িদ পাশার কনসেশন লাভ করেন। ২৫ শে এপ্রিল ১৮৫৯ সালে ভবিষ্যত বন্দর সায়িদ (Port Said) এর শোর (Shore) (কিনারা) থেকে খননের কাজ শুরু হয়। এক হিসেবে ৩০ হাজার দাস (বাধ্য শ্রমিক) ১০ বছর সময়ে (১৮৫৯-১৮৬৯) এ খননের কাজ শেষ করে। বিভিন্ন দেশের ১.৫ মিলিয়ন এর বেশি লোক এখানে কাজ করেন, এবং হাজার হাজার শ্রমিক মারা যায়। ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে ১৭ নভেম্বর ১৮৬৯ সালে এই খাল খুলে দেয়া হয়। বর্তমানে এই খাল দিয়ে পর্বত সদৃশ জাহাজ চলাচল করে। (৫৫:২৪)। এক হিসেবে ২০১২ সালে সুয়েজ খাল দিয়ে ১৭,২২৫ টি জাহাজ (প্রতিদিন ৪৭৯টি) পারাপার হয়।

পানামা খাল আর সুয়েজ খালের তফাৎ:

চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে, পানামা খালের (দৈর্ঘ্য ৫১

মাইল, একদিকে আটলান্টিক অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগ করেছে) মত সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। সুয়েজ খালের জোয়ার-ভাটার (টাইডাল) সীমা হলো- স্প্রিং টাইডে 'পোর্ট সায়িদে'র উত্তরে পানির উচ্চতার স্তর হয় ১ ফুট ৬ ইঞ্চি, আর দক্ষিণ সুয়েজে হয় ৬.৫৬ ফুট। হাই টাইড (জোয়ার) দুই জায়গায় একই সময়ে হয় না কিন্তু দুই শেষ মাথার মধ্যে পানির স্তরের সর্বোচ্চ ব্যবধান ৪-৬ ফুটের বেশি হয় না। তাই পানামা খালের মত সেখানে জাহাজ চলাচলের জন্যে কোন লকের প্রয়োজন হয় না। পানামা খালের দুই মাথায় (পানামা এবং ক্লোন) যদিও গড় সামুদ্রিক লেভেল একই কিন্তু টাইড এর উঠা নামার লেভেল ভিন্ন, ক্লোনে ২.৫ ফুট এবং পানামায় ২১ ফুট। সমুদ্রগামী নাবিকরা বলেন পানামায় জাহাজ চালানো অত্যন্ত কষ্টের কাজ কারণ জাহাজকে শিকল দিয়ে বাঁধতে হয় এবং লকের মাধ্যমে খুবই কষ্ট সহকারে খাল অতিক্রম করতে হয়। যার প্রয়োজন সুয়েজ খালে হয় না। পানির (উচ্চতার লেভেলের ভিন্নতার কারণে সুয়েজের একদিকের (উত্তরের) দরিয়া (ভূমধ্যসাগর) আরেক দিকের (দক্ষিণের) দরিয়ার (লোহিত সাগর) উপর আপতিত হয় না, ভিতরে রয়েছে এক বেরিয়ার (বরজাখুন) (৫৫:২০)।

চৌদ্দশত বছর পূর্বে কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যতবাণী এখন বাস্তবে:

১৪'শ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন জানিয়ে দিয়েছে, এই দুই সমুদ্রে পর্বত সদৃশ জাহাজ সহজে চলাচল করবে (৫৫:২৪)। সংযোগ স্থাপিত হবে দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের মাঝে। সুয়েজ খাল পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে হাজার হাজার মাইল (৫৫০০ মাইল, লন্ডন থেকে আরব সাগর) নৌপথ কমিয়ে দিয়েছে। এটা আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। সুয়েজ খাল না হলে পুরো দক্ষিণ আফ্রিকার'উত্তমাশা অন্তরীপ' ঘুরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পণ্যবাহী জাহাজকে চলাচল করতে হতো। সময় অনেক বেশী লাগতো।

উপসংহার:

সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা উভয়ে (জ্বীন ও ইনসান) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"

আল্লাহর দেয়া মহা অনুগ্রহে আজ এই সাগরে পর্বত সদৃশ জাহাজ সহজে চলাচল করে। মানবজাতির সার্বিক জীবনের কর্মকান্ড সঠিক এবং সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য পৃথিবীর বুকে এক অলৌকিক গ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ। এই আল কুরআনকে বাদ দিয়ে মানুষ বের করেছে মনগড়া মতবাদ এবং মানবতার মুক্তির উপায়। আর এ জন্যই একে একে সব উপায় উপকরণ অচল হয়ে পড়েছে। মানবকুল আজ অশান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত। সন্ত্রাসের দাবানল, ড্রাগের দাবানল, ক্ষমতার দাবানল, ব্যাভিচার-অবিচারের দাবানলে আজ পৃথিবীর শান্তি জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে। দিশেহারা মানুষ আজ পাগল প্রায়। আল্লাহর দেয়া মহা অনুগ্রহ চলার পথের সার্বিক দিশা আল-কুরআনকে অবমাননা, অবহেলা তথা প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে অস্বীকার (অনুপস্থিত) করার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা আজকের অশান্ত পৃথিবীর সকল স্তরের মানুষের তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের অসহায় অবস্থানই সত্য বিবর্জিত ছল-চাতুরতা প্রমাণ করে।

আসুন আমরা সবার সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আল-কুরআনকে বুঝি এবং সার্বিক কর্মকান্ডকে কুরআনের রঙে রঞ্জিত করি। তাহলেই কেবল ইহকাল এবং পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহকে স্বীকার করা হবে এবং শান্তির সার্বিক আস্বাদ পাওয়া যাবে। কেবল তখনই আমরা সাগরের অন্ধকার সদৃশ অচল পথ থেকে আলোর পথে আসতে পারি এবং কেবল তখনই দাবি করতে পারি আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী বা মুসলমান।

তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যপঞ্জী:

১। Dewan, J. (editor) 1999;Islam and Science: Seas and Oceans; 'Iqra' 19(2): 19-20, Mag. South Bay Islamic Association, San Jose Ca 95112, USA.

২। Khan, K.M. Raisuddin 1988; The Quran on the Conception of the Suez Canal; The Bangladesh Observer, Friday,22 January, Dhaka.

৩। Ali, Abdullah Yusuf (Translation and Commentary) 1989, The Holy Quran, Amana Corp. Brentwood, Maryland, USA.

৪। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩, কুরআনুল করিম।

মহাকালের শপথ

লেখক: জিয়াউল হক

রিভিউ লিখেছেন: আমান উল্লাহ, ৭ম সেমিস্টার, দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি

বইটিকে লেখক মুসলমানদের চিন্তার খোরাক, সৃজনশীল গঠনমূলক নিজস্ব প্রস্তুতি, আত্ম-সমালোচনা, নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্যের সচেতনতা জোরদার করার প্রতি আগ্রহী হওয়ার মতো করে সাজিয়ে লিখেছেন । বইটি মনোযোগ সহকারে পড়লে আপনার চেতনা নাড়া দিবে।

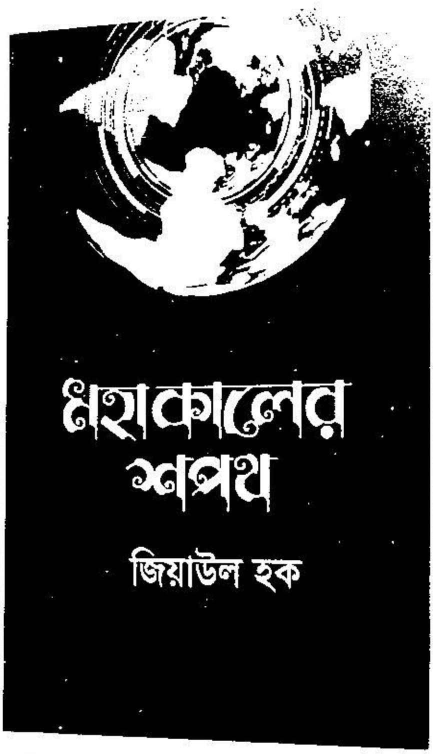

আপনাকে প্রাক্টিসিং মুসলিম হতে, উৎসাহিত করবে প্রভুর উপাসনায় মত্ত হতে। লেখকের লেখা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বেশ কিছু বাস্তবসম্মত গল্প পড়ে নিজের অজান্তেই চোখের কোণে পানি জমেছে। প্রতিটি লেখায় রয়েছে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। বিশ্ব মানচিত্রে ইসলামের মশাল দীপ্ত করার সুপ্ত প্রেরণা। মনে হচ্ছে, একজন সফল মুসলিম দাঈ ইলাল্লাহর জীবনী পড়ছি এবং আমিও দাওয়াতের বিশাল মঞ্চে পদচারণা করছি। আল্লাহ পাক মহাকালের শপথ বইয়ের লেখক জিয়াউল হক স্যারকে নেক হায়াত দান করুক।

এক

সবাই বংশগত বা কালিমা পড়া মুসলমান। তবে অধিকাংশই কুরআন শরীফকে উপলব্ধি করতে পারে না আবার অনেকে তো পড়তেই জানে না। তাহলে কীভাবে দিবে সত্যের সাক্ষ্য, কী করে হবে মুসলিম? চিন্তা করেছেন কভু? দাউদ এর মতো যুবক কুরআন শরীফের সামান্য এক লাইন অনুবাদ পড়ে চার পাঁচ ব্যবধানে মুসলিম হয়। আর মুসলিম যুব সমাজ পাঁচ বছরের ব্যবধানে ঈমানের কাছে পরাজিত হয়। যা শুধুই আফসোস!

দুই

"চাকরি করতে এসেছি, ঈমান বেচতে নয়, কাল কিয়ামতে অতিরিক্ত টাকার জবাব কী দেবো!" যদিও নৌকার মাঝি ছিলো খুবই গরীব, ওয়াক্তের খাবারগুলোও খেতে পারতো না, সংসারে টানাপোড়েন চলতো, কষ্টে জীবন যাপন করতো, কিন্তু কখনো জেনে বুঝে নামাজ ছাড়েনি, কারণ ইবাদতে ছিলো তৃপ্তি, হাজার-কোটি অসুবিধার মাঝে স্বস্তি, আর এ প্রাপ্তি শুধু মুসলিমেরই। এ মাঝির করুণ অবস্থা ও উন্নত চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে ঈমান এনেছিলো মেজর ডগলাস মিসি। এই ছিলো মুসলিমদের তাকওয়া ও সততা, আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের ভয়, নবী প্রেম ও ঈমানের চেতনা।

তিন

কর্ণেল রিড ও মুসলিম এক সাধারণ সৈনিকের জীবন চরিত্র, গল্প নয় যেন এক জীবন্ত ঈমান! যার জীবনী পর্যালোচনায় বোধগম্য হয় ইসলাম তো এমনি এক দর্শন ও শিক্ষা যা গোপনে, নিভৃতে, সবার অগোচরে আল্লাহকে ভয় করে। তার অবাধ্য হতে বিরত রাখে।

অথচ আজ মুসলিমরা ভুলে গেছে নিজেদের সভ্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। জীবন্ত ঈমান মরে গিয়ে হয়েছে অবাধ্য ও তাকওয়া শূন্য। যেন সে বিজাতীয় ও বিধর্মী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট এক পরগাছা। মতানৈক্য ও

বিদ্বেষের আঘাতে জর্জরিত আজ ইসলাম ধর্ম। প্রচার তো দূরের কথা, ওয়াজেও লোক দেখানোর কাজে ব্যস্ত আজ মুসলিমরা। অথচ তারা যদি নিজেদের আদর্শে আদর্শবান হতো, অভ্যস্ত হতো নৌকার মাঝি বা সৈনিকের মতো। তাহলে তাদের এই খোদাভীতি, সৎ চরিত্র এবং উত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীরা ইসলামের শত্রু না সেজে ইসলামের প্রেমিক হয়ে যেত, যার প্রমাণ বহুকাল পূর্বের এমন অহরহ ঘটনা ।

চার

গবেষক সাংবাদিক লেখক মাইক এর ধর্ম গ্রহণ সাথে পুরো পরিবার। নতুন কিছু না বলতে গেলেও আজ আমরা নিজেদের কাফের মুনাফেক বানাতে ব্যস্ত, অথচ মাইক মুসলিম হলেন শেষ বয়সে। আর উনার আফসোস কেন আরো আগে দা'ওয়াত পায়নি। তা সত্ত্বেও উনি যেমন দাঈ ইলাল্লাহর কাজ করেছেন যার বাপ-দাদা মুসলিম আছে সেও করতে পারেনি। বড়ই দুঃখের সাথে বলতে হয়! আমার পাশের অমুসলিম ভাইকে দাওয়াত দিতে ভুলে গিয়ে আজ আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বিপরীতে উনারা মুসলিম হয়ে মুসলমানদের ঈমানী কর্ম নিজ হতে পরিদর্শন করছে। এখানেই আমাদের ব্যর্থতা! দায়িত্বশীলতার অভাব, ইসলামকে সঠিক ভাবে বুঝার অভাব, দা'ওয়াতের অভাব!

পাঁচ

ইস্তফা দেওয়া বৃটিশ সৈনিক বিলের ইসলাম গ্রহন। অথচ উনাকে কেউ দাওয়াত দেয়নি, বরং আল্লাহ পাক হেদায়ত করেছেন। উনি উপলব্ধি করেছেন, মুসলিমরা শত কষ্ট জ্বালা নিপীড়ন ও বৃটিশ আমেরিকা বা সবাই তাদের উপর অত্যাচার করলেও আজানের সাথে সাথে মুখে ফিরে আসে হাসি, হতদরিদ্র হওয়ার পরেও চলাফেরায় রয়েছে নবাবী। ঈমানী একটা স্পিড পাওয়ার যা পৃথিবীর কেউ দমাতে পারে না। কারণ এটাই যে পরকালের চাবিকাঠি। তবে আজকের যুব সমাজের এমন অবনতি যে, আজান শুনলে বেড়ে যায় গানের আওয়াজ। নামাজ তো দূরে কথা শরীরকেই সদা করে রাখে নাপাক। আদব-শিষ্টাচার ও চরিত্র মাধুর্যতা অধঃপতনের কথা তো উল্লেখ করার মতো নয়।

ছয়

নিউক্যালসে মুসলিম সেন্টার তৈরি ও লন্ডনে ইসলাম প্রচারে মুসলিমদের অবদান। প্রতিনিয়ত অভিনব পন্থায় ইসলামের দাওয়াত, বিভিন্ন সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অমুসলিমদের আল্লাহর পথে আহ্বান। নওমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ও ইসলাম গ্রহণের গল্প মন জুড়ানোর মতো। তাই আজ পৃথিবীর সকল মুসলিমদের প্রয়োজন ইসলামের এক পতাকা তলে সমবেত হয়ে দা'ওয়াতের মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

সাত

"আমরা কুরআনের পাঠক হয়েছি, হতে পারিনি প্রতিচ্ছবি "কুরআন শুধু তেলোওয়াত করবো বলে আজকে পাঠ্যপুস্তক বানিয়ে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখেছি, ইচ্ছে হলে ধরছি, রাখছি। কখনো ভাবিনি যে কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত নাযিল হওয়ার রহস্য কি! কখনো কোন মুসলিম যুবক স্বেচ্ছায় দু-লাইন বুঝতে আসে এমন খুব কম পাওয়া যাবে। বাকি কুরআন আছে এইটাও মেবি ভুলে গেছে! নিজেকে মুসলিম দাবি করি ঠিক কিন্তু ধর্মগ্রন্থ কুরআনের যথার্থ মূল্যায়ন করতে ভুলে গেছি। কুরআন না বুঝলে আমি কেমন মুসলমান তা কখনো ভাবি কি?

আমরা যাদের কুরআনের রোল মডেল বলে অহংকার করি কখনো কি তাদের মতো হতে চেয়েছি। হাফেজে কুরআনদের জন্য রয়েছে কত সুসংবাদ, তবুও আজ কুরআন মুখস্থ করা থেকে আমরা কত পিছিয়ে।

আট

নির্মল একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি চেতনা ও জীবন্ত ঈমানের প্রমাণ বহনকারী। মন জুড়ানো, আবেগ আপ্লুত, চোখে জল আসার মতো এই ইতিহাস যা নির্মল তৈরি করে গেছেন। যা আমাদের মতো বহুকাল ধরে ইসলাম পালন করে আসা মানুষ গুলো পারেনি ! একজন হিন্দু যুবক কারো দা'ওয়াত ছাড়া কুরআনের প্রেমে ইসলাম গ্রহণ ও পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচানোর পিছনে যে কত ত্যাগ-তিতিক্ষা, পরিশ্রম ব্যয় করতে হয়েছে যা সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। আজও এইভাবে গড়ে উঠা প্রয়োজন মুসলিম যুবক ভাইদের সম্পর্ক তাদের পরিবারের সাথে।

নয়

শেখ দ্বীন মোহাম্মদ ও ইহুদি ঘরে জন্ম নেওয়া লিওপোল্ড লুইস (মুহাম্মদ আসাদ) কুরআনের তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। পৃথিবীতে এতো মুসলিম আলেম-উলামা, মুফতি থাকতেও কেউ দাওয়াত নিয়ে যাইনি। বরং নিজ ভালোবাসা থেকে মুসলিম হয়ে ধর্ম প্রচারে আত্মত্যাগ করেন। অথচ আমরা আজকের আধুনিক দুনিয়ায় নতুন এক মুসলমানের পরিচয়ে উদিত হয়েছি। আমাদের মাঝে হিন্দু মুসলিম খুঁজতে গেলে চেনা কঠিন হয়ে যায়। কি ছিলো আমাদের করার, কি করছি আমরা সেই চিন্তা করি না। পুরাতনরা আছে নিজের বাপদাদা ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্বে আর নওমুসলিমদের কাছে ইসলাম পরিণত হয়েছে মজার ধর্মে। এই হলো বর্তমান অবস্থা।

দশ

শেষ কথা হচ্ছে, সফলতার জন্য প্রয়োজন একমাত্র জীবন বিধান আল কুরআনের সাধনা। তাই একজন সফল মুসলিম হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন বুঝার কোন বিকল্প নেই। কুরআন আকড়ে ধরে দৈনন্দিন জীবনের পথ চলা হলেই জীবন হবে সুখময়, সমৃদ্ধ ও আত্মতৃপ্ত।

সুতারাং অবশ্যই কুরআন বুঝতে হবে, দ্বীনী প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞাবান হতে হবে। পূর্ববর্তী নবী রাসুলদের জীবনী, ইসলামের ইতিহাস, বিভিন্ন জাত-গোষ্ঠীর অবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিণতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবেই ইহকালে একজন খলিফা ও দায়িত্বশীল মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভিশনারি মুসলিম

সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান
খন্ডকালীন শিক্ষক, দাওয়াহ বিভাগ, আইআইইউসি

পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যে রাজার মসনদে আরোহণের জন্যই ইসলামের জন্ম হয়েছে। মানবসৃষ্ট সকল ধর্ম, বর্ণ ও মতবাদ যেখানে ইসলামের সুমহান মানবতাবাদী আদর্শ ও নীতিমালার আলোকে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম ও মত অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে ।[১]

কুরআন এমনি এক ভিশনারি দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রায়িত করেছে আমাদের সামনে। যাতে করে আমাদের চিন্তা, মনন ও মানসিকতায় লালিত হয়, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বিশ্বনেতৃত্ব গ্রহণের আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন এবং জারি থাকে সেই স্বপ্ন রুপায়নের অবিরাম প্রচেষ্টা।

নবী করিম (সঃ) বলেন,[২]

إن الله يحب مَعالي الأمور ويكره سَفاسِفها

মর্মার্থ হচ্ছে, যে কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এবং মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেক পছন্দ করেন। আর সমাজে যেনতেন অবস্থান নিয়ে বসবাস করাকে তিনি অপছন্দ করেন। কারণ, এতে করে Sense of Honor (مروءة) নষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রঃ) বলেনঃ "মুসলিম ব্যক্তিত্ব কখনই সর্বোত্তম কাজ, সর্বোত্তম অবস্থান এবং সর্বোত্তম ফলাফল ছাড়া সন্তুষ্ট হয়না। আর ব্যক্তিত্বহীনরা মাছির মত যেখানে সেখানেই অবস্থান করে। মূল্যহীন বিষয়বস্তুকে ঘিরেই তাদের জীবন পরিচালিত হয়"।[৩]

সমাজে বিপরীতধর্মী এই দুই শ্রেণীর মানুষ তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, মিশন এবং ভিশন নিয়ে কাজ করা বা না করা। এক্ষেত্রে সফলতার মূলমন্ত্র হচ্ছে, লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া। এ দুইয়ের সমন্বয় ছাড়া স্বর্ণশিখরে আরোহণ এককথায় অসম্ভব।

আমাদের ছাত্রদের একটি বড় অংশ অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী। তাঁদের কাছে যদি প্রশ্ন রাখা হয়, কোন লক্ষ্যপানে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ? দশের নয়জন এর যথাযথ উত্তর দিতে অপারগ হবে। তাঁদের পরিণতি হচ্ছে গন্তব্যহীন জাহাজের মত, যা গভীর মধ্যসমুদ্রে উদভ্রান্তের মত ঘুরপাক খাচ্ছে।

এর ঠিক বিপরীতমুখী আরেকটি গোষ্ঠী আছে, যারা শুধু স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে। ঘরের প্রকোষ্ঠে বসে বসে সমাজকে পরিবর্তন করে দিতে চায়। যথাযথ উদ্যোগ এবং পদক্ষেপ না নিয়ে শুধুমাত্র স্বপ্নের ঘোরে বাস করাটাও নিতান্তই বোকামি। কুরআন এটাকে أماني হিসেবে নামকরণ করেছে।

আমানি (أماني) হচ্ছে, কোন ধরনের পরিকল্পনা, কর্মতৎপরতা ছাড়াই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখার নাম। স্বভাবগত দিক থেকে এটি ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা জেরুজালেম জয়ের স্বপ্ন দেখত, কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে তা জয়ের যুদ্ধে শরীক হতনা।[৪] তারা জান্নাতের শুধু স্বপ্নই নয়, জান্নাতকে কেবলমাত্র নিজেদের আবাসস্থল বলে দাবী করত। জবাবে কুরআন বলছে, এটা তাদের অলীক স্বপ্ন মাত্র। যদি সত্যিকার অর্থে তারা জান্নাত কামনা করত, তবে অবশ্যই তারা এর জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করত।[৫]

আল-কুরআন অভিনন্দন জানায় সেই প্রচেষ্টাকে, যেখানে সমন্বয় ঘটে সঠিক লক্ষ্যমাত্রা এবং সঠিক কর্মপন্থার। যার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয় সোনালি সকাল।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

অনুবাদঃ "আর যে মুমিন আখেরাতকে অর্জনের স্বপ্ন দেখে এবং তাঁর সকল যোগ্যতা ও দক্ষতাকে তা অর্জনের চেষ্টায় খরচ করে, অবশ্যই তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার"। (ইসরাঃ ১৮)

নবীজির (সঃ) খেদমতে অনেক কষ্ট করতেন সাহাবি রাবি'য়াহ বিন কা'ব আল-আসলামি (রাঃ)। নবী করিম (সঃ) একদিন বলেই বসলেনঃ سلني يا ربيعة أعطك "আজ আমার কাছে কিছু চাও রাবি'য়াহ, আমি তোমাকে দিতে চাই"।[৬] কেমন উঁচু মানের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন সাহাবায়ে কেরাম। অভাবগ্রস্থ সাহাবারা দুনিয়ার কোন লক্ষ্যমাত্রাকে লক্ষ্যমাত্রাই মনে করতেন না। সাহাবি রাবি'য়াহ (রাঃ) চেয়ে বসলেন মুমিন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাকসাদ, জান্নাতে নবীজির (সঃ) প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্যতা অর্জন। أسألك مرافقتك في الجنة সাহাবির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দূরদর্শিতা দেখে নবিজি (সঃ) অনেক খুশি হলেন। কারণ, জান্নাতে নবীজির (সঃ) সাথী হওয়া মূলত সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতের বাসিন্দা হওয়া।

তবে তিনি সেই লক্ষ্যমাত্রার পথে পাথেয় হিসেবে কিছু কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিলেন।

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ অর্থাৎঃ "তোমার সেই স্বপ্ন পূরণে বেশি বেশি সেজদার মাধ্যমে তুমি আমাকে সহযোগিতা কর"।

সুতরাং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে একজন মুমিন মুসলিম হবে বিশালতার প্রতীক। পার্থিব জগতের সকল চাহিদাকে ছাপিয়ে এর ব্যাপ্তি ঘটবে অনন্ত সমৃদ্ধির পথে। কুরআন বলছে,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

ভাবার্থ হচ্ছে, "তোমরা তোমাদের অন্তিম লক্ষ্য জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাক। আর তোমাদের জন্যই তো এর বিনির্মাণ হয়েছে"। (আলে ইমরানঃ ১৩৩)

উম্মাহকে উচ্চাভিলাষী[৭] (ambitious) হিসেবে গড়ে তুলতে প্রচুর প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন নবীজি (সঃ)। বলতেনঃ إذا سألتم الله الجنة فاسئلوا الفردوس الأعلى "যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করবে, তখন অবশ্যই জান্নাতুল ফিরদাউসকেই চেয়ে নিবে"।[৮]

জীবন হচ্ছে মূলত একটি সিঁড়ির মত। অসংখ্য লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয়ে এই জীবনসিঁড়ি গঠিত। এক লক্ষ্যপানে উপনীত হলে, পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে আমাদের ছুটে যেতে হবে। কোন এক সিঁড়িতে পৌঁছে নিজকে সফল ভেবে থেমে গেলে চলবে না। সুতরাং সকল সিঁড়ি পাড়ি দিয়ে জান্নাতের সিঁড়িতে পদচুম্বন না করা পর্যন্ত মুসলিমদের থেমে থাকার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের পঞ্চম খলিফা খ্যাত হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয (রাঃ) বলতেনঃ "আমি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী একজন মানুষ। তাই আমি সবসময় নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতাম। অতঃপর নেতৃত্ব যখন হাতে এসে গেল, খলিফা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। অতঃপর যখন খিলাফাহ আমি অর্জন করলাম, এখন আমি জান্নাত লাভের স্বপ্ন দেখি। আশা রাখি, স্বপ্ন পূরণের সকল মনযিলে সফলতার পর এই মনযিলেও মহান আল্লাহ আমাকে সফল করবেন"।[৯]

ভিশনারি মুসলিমদের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে দৃঢ় ও অনড় থাকাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর কালামকে পৃথিবীর প্রতিটি পথ-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয়ার মিশন নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন মহানবী (সঃ)। তাঁর সমাজে এমন লোকের বসবাস ছিল, যারা সম্পদের পাহাড় গড়া, সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ, ক্ষমতার মসনদে আরোহণ, এসবকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে সাব্যস্ত করত। তাই তারা নবীজির (সঃ) মিশনকে নিজেদের মিশনের মত ভেবে বসল। ভাবল, এসব পেলেই বুঝি তিনি শান্ত হবেন। দিয়ে বসল, সম্পদ, রমণী আর ক্ষমতার মত কিছু চাকচিক্য লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু লক্ষ্যপানে অটুট বিশ্বনবী (সঃ) দৃঢ়পদে প্রত্যাখ্যান করলেন আয়েশি সকল আয়োজন। এগিয়ে গেলেন বিজয়ের সোপানে দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে।

এক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় হচ্ছে, অনেক বড় হওয়ার গল্পগুলো সবসময় অনেক পরিশ্রমের হয়। তাই পরিশ্রমের মানসিকতা লালন করেই আমাদের জান্নাত লাভের স্বপ্ন দেখা উচিত। হাদিসের ভাষ্য মতে, জান্নাত হচ্ছে কষ্ট, ক্লান্তি ও পরিশ্রমের চাদরে আবৃত এক বাগানের নাম।[১০] উদ্দেশ্যহীন আরাম আয়েশি জীবন পরিচালনা করে কখনই সেই বাগানে প্রবেশ করা যায়না।

পরিশেষে বলতে চাই, অনেকে যুহদের শ্লোগান তোলে দুনিয়ার সকল পরিকল্পনা, তৎপরতা থেকে দূরে থাকতে চান। তারা দুনিয়ার সকল কার্যকলাপকেই তাকওয়ার খেলাফ বলে মনে করেন। অথচ যুহদের ব্যাপারে নবীজির (সঃ) বক্তব্য স্পষ্টঃ

الزهد ليس بتحريم الحلال، ولكن أن يكون بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه.

ভাবার্থঃ "আল্লাহর দেয়া হালাল নেয়ামতরাজিকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়াটা খোদাভীতি ও আখেরাতমুখীতার প্রকাশ নয়, বরং তা হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার নাম"।[১১]

অন্যভাবে বলা যেতে পারে, জাগতিক অর্থ-সম্পদের মালিকানা হওয়াটা দোষের কিছু নয়। দোষের হচ্ছে, এই সম্পদ আর জগতের গোলাম হয়ে যাওয়াটা। সুতরাং, যুহদ হচ্ছে পরিকল্পনামাফিক দুনিয়ার জীবন, যা আখেরাতকেন্দ্রিক হবে। আত্ম-উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণকে দুনিয়াবি ভাবাটাই জাহেলিয়াত। কুরআন থেকেই যুহদের সর্বোত্তম মানহাজটা আমাদের শিখে নেয়া উচিত।

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

অনুবাদঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন, সেখান থেকে আখেরাতকে তুমি অন্বেষণ কর, তবে দুনিয়ার অংশ নিতেও ভুলে যেওনা। (কাসাসঃ ৭৭)

তথ্যসূত্র ঃ

১. সূরা তওবা ঃ ৩৩ ২. হাদিসটি ইমাম তাবরানী (রঃ) তাঁর "আল-মু'জামুল কাবির" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আলবানী (রঃ) একে "হাসান" বলেছেন ৩. আল-ফাওয়াইদ, ইমাম ইবনুল কায়্যিম ৪. সূরা মা'য়িদা ঃ ২৪ ৫. সূরা বাকারা ঃ ১১১ ৬. সুনান আন-নাসায়ি, কিতাব আত-তাতবিক, হাদিসঃ ১১২৬ হাদিসটি ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ৭. এখানে দুনিয়াকে অর্জনের ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিশালতা উদ্দেশ্য ৮. সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ২৭৯০ ৯. ইসলামের পঞ্চম খলিফা উমর বিন আব্দুল আযিয, লেখকঃ আব্দুস সাত্তার শাইখ দারুল কালাম, দিমাস্ক থেকে প্রকাশিত। ১০. দেখুন, সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ২৮২২ ১১. কিতাব আল-যুহদ, ইমাম ইবনে আবি আল-দুনয়া

প্রেমের নতুন আল্পনা

শায়খ মাহমুদুল হাসান

◆ পরিচালক, টিভি ওয়ান, যুক্তরাজ্য; ◆ প্রিন্সিপ্যাল, ইসলামী একাডেমী, এসেক্স জামে মসজিদ ট্রাস্ট, লন্ডন;
◆ প্রাক্তন শিক্ষক, আইআইইউসি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পাহাড়ের উঁচু চূড়াকে এক খন্ড মেঘ এসে আলতো করে ছুঁয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার এসে মেঘ খন্ড চুমো খেল পাহাড়ের কপালে। আমি দৃশ্যটি দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুনশান নীরব এক জায়গা। পিচঢালা মসৃণ পথ। হঠাৎ হঠাৎ শাঁ করে কোন দ্রুতগামী কার পাশ ঘেঁষে ছুটে যায়। গাঢ় সবুজ বেষ্টিত পর্বতময় ও মেঘময় এ লোকালয়ে এসেছি তিন দিনের জন্য। এখানে মাঝে মাঝে মেঘগুলো কালো আধার সৃষ্টি করে। বাতাসে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড তান্ডব। মনে হবে ঘর-বাড়িগুলো তছনছ হয়ে যাবে। মিশে যাবে মাটিতে। কিছুক্ষণ তর্জন-গর্জনের পর শুরু হবে বর্ষণ মুষলধারে। জগতের সব কালিমা, ময়লাকে যেন ধুয়ে মুছে করে ফেলবে ধবধবে। তারপর এক প্রশান্ত আবহ। মালয়েশিয়ার হুলুলাঙ্গেত জেলার একটি জনপদ এটি। কুয়ালালামপুর বিমান বন্দর হতে প্রায় দেড় ঘন্টার ড্রাইভের দূরত্বে অবস্থিত। সুন্দর একটি বাংলোতে উঠেছি এখানে। সালাতের সময় হলে মিনার হতে আজানের ধ্বনি ভেসে আসে আর কেমন দিশেহারা করে তুলে। সন্ধ্যা যখন এখানে নেমে আসে সাথে করুণ সুরের আজান মনকে আনচান করে তুলে। অবচেতনে কবি কায়কোবাদের পংক্তিগুলো অনুরণিত হয় মনের গভীরে।

কে ওই শোনালো মোরে আযানের ধ্বনি।
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী
কি মধুর আযানের ধ্বনি।

কি যে এক ঢেউ উঠে ভক্তির তুফানে
কত সুধা আছে সেই মধুর আযানে।

বাংলো হতে বেরিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে হাঁটছি। সন্ধ্যা তখন নেমে আসছে। চতুর্দিকে নীরবতা। ঘন গাছ-গাছালি, পথের বাঁক নিতে জঙ্গল হতে বেরিয়ে আসল সুরম্য এক মসজিদ। উঁচু মিনার। মনে হলো গাছ-ঝাড়ের পেছনে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ বেরিয়ে এসে আমাকে চমকে দিতে চেয়েছে। আশ্চর্য এক লুকোচুরি! পুরো পথচলা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করলাম। কতদিন এমন নির্মল প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটানো হয়নি। এ মসজিদ ও এর সাথে সু-বিস্তৃত মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে 'মুলতাকা মালয়েশিয়া'। বর্তমান সময়ে গ্রহণযোগ্য বরেণ্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব শায়খ জুলফিকার আহমদের সাহচর্যে উপকৃত হওয়ার জন্য এ জমায়েত। ভারত-বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের উলামা-মাশায়েখ সমবেত হয়েছেন আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য। ভোর সকালে কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে নেমে দেখলাম বেশ কিছু সাদা পাগড়ি ও সাদা জুব্বা পরিহিত ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতোমধ্যে এসে পৌঁছেছেন। তাদের দেখে মনে অদ্ভুত স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল। 'মুলতাকায়' যোগ দিতে আসা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী খুবই নিষ্ঠা ও যত্নের সাথে তৎপর ছিল বিমান বন্দরে।

আমাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমার প্রিয় বন্ধু শায়খ মুহাম্মদ বিন জাফর (যিনি হযরতজীর বিশিষ্ট শিষ্য ও ঘনিষ্ট সাহচর্যপ্রাপ্ত) তার শিষ্যকে প্রেরণ করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার আলী মালয়েশিয়ায় পিএইচডি করছেন আবার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে চাকুরিও করছেন। আলীর পোষাকে মনে হয়নি তিনি একজন প্রকৌশলী ও উচ্চ শিক্ষারত। তার সাদা পাগড়ি ও জুব্বা ইঙ্গিত করছে ইসলাম চর্চা তাকে কত আমুল পরিবর্তন করে দিয়েছে। তার বিনয়, আন্তরিকতা ও সহযোগিতা করার চেষ্টা দেখে মনে হল কোন এক কর্মচারী বা শ্রমিক। আলী আমাকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্ট হতে গন্তব্যের দিকে রওনা হল। গাড়ি কুয়ালালামপুর হাইওয়ে ধরে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আর আমরা বিভিন্ন বিষয়ে টুকিটাকি গল্প করছি। মালয়েশিয়ায় আধুনিকতা ও উন্নতির স্পর্শ দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে হল ইউরোপের কোন রাজপথে গাড়ি ছুটছে। আলীর বাসায় সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে হুলুলাঙ্গা রওনা হলাম। জুমার নামাযের সময় মসজিদে

পৌঁছে প্রথম দেখা হল প্রিয় মুহাম্মদ বিন জাফরের সাথে ঠিক এক দশক পর। তিনি এ এক দশকে অনেক পরিবর্তন হয়েছেন। দাঁড়ি পেকে গেছে পুরোপুরি। সাদা পোষাক ও পাগড়িতে তিনি যেন ভিন্ন কোন শায়খ। তার উপর হযরতজ্বীর সাহচর্যের উদ্ভাস তাকে যেন তারকা বানিয়ে ফেলেছে। তবে তার দৃষ্টির চাকচিক্য, কথা বলার ভঙ্গি, চামড়ার ঔজ্জ্বল্য ও স্বভাবসুলভ এক গেঁয়েমি ও হেয়ালিপনা এখনো আগের মতই আছে। 'করে ছাড়ব' সুলভ জেদ তার মধ্যে এখনো দেদীপ্যমান। কোলাকুলির পর আমি হাসিচ্ছলে বললাম 'বেশতো জমিয়ে ফেলেছেন।' উত্তরে বললেন 'কৈ জমাতে পারলাম।' আসলে হযরতজ্বীর সংস্পর্শ তাকে ভিন্ন মর্যাদায় আসীন করেছে। জীবনে নতুন রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে।

হযরতজ্বী ইতোমধ্যে 'মুলতাকা' স্থলে পৌঁছেছেন। সন্ধ্যা হতে প্রতিদিন মাগরিব ও এশার মাঝে তার বয়ান হবে। যারা এ আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন তাদের জন্য হযরতের পক্ষ হতে দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ সালিম বিজনুরী কিছু নির্দেশনা ব্যাখ্যা করছেন। এখানে অবস্থানের সময় যেন পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়, এর থেকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপকার অর্জিত হয় সে জন্য নির্দেশনাগুলো মেনে চলার তাগিদ দেয়া হয়। এ'তেকাফের ভাবাদর্শে সময় অতিবাহিত করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হল। পরিচিতদের সাথে আড্ডা-গুজবে যেন সময় নষ্ট না হয়।

আরবী এক পংক্তিতে বলা আছে "মানুষের আড্ডা তেমন কোন উপকার বয়ে আনে না, শুধুমাত্র অর্থহীন গল্প ও আজে বাজে উক্তি-ই হয় আড্ডার সারাংশ।"

হযরতজ্বীর ছবি আগেই আমি অনলাইনে দেখেছি। আজ সালাতের জামাতে শরিক হওয়ার জন্য যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন কাছে থেকে দেখতে পেলাম। অদ্ভুত আলো তার চেহারা ও শুভ্র শশ্রুমালাকে যেন অভাবিত মায়াবী করে তুলেছে। চেহারার সৌন্দর্য, কথা বলার মিষ্টতা, অনর্গল তথ্যের প্রাচুর্য, অন্তর নিংড়ানো শুভাকাঙ্খা, আধুনিক জ্ঞান ও ইলমের সনম্বয়, উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে অবস্থানের সংমিশ্রিত অভিজ্ঞতা এবং হাদীছ ও সুন্নাতে রাসূলের (সঃ) উপর অবিচলতা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। তিন দিনের প্রোগ্রামে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে ছিল স্থিরতা, দৃঢ়তা ও আল্লাহর ভালোবাসার উষ্ণতা। শুকিয়ে যাওয়া অন্তরে তার কথাগুলো বৃষ্টির মত আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। চৌচির হওয়া ফসলের মাঠে তাঁর বয়ান যেন নতুন উর্বরতা তৈরি করে। শুষ্ক চোখগুলোতে তার মজলিস যেন বান ডাকে। অনর্গল টপটপ ঝরে অশ্রু। কেন এ কান্না! কেন এ প্লাবন! এত আবেগের আমদানি কোথা থেকে হল! উত্তর জানা থাকেনা। তার বয়ানের পূর্বে দীর্ঘ প্রশংসা বাণী তার জন্য আওড়ানো হয়না। হাজারো অন্তরে আল্লাহ প্রেমের উত্থাল-পাতাল জোয়ার সৃষ্টি করে, কিন্তু উন্মাদনা, নাচানাচি ও হৈ চৈ থাকেনা। যেন প্রশান্ত সাগরের ভরা জোয়ার!

আত্মশুদ্ধি ও 'তাজকিয়া' রাসূলের (সঃ) অন্যতম মিশন হিসেবে কোরআন সাব্যস্ত করেছে বার বার। 'যুহদ' বা দুনিয়া বিমুখিতা হাদীস ভান্ডারের অনন্য মূখ্য বিষয়। কিন্তু এ অধ্যায়টি বর্তমানে নানা কু-সংস্কার ও বেদাতের বেড়াজালে আটকে গেছে। তাই যখন-ই অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের জন্য কোন গাইড ও মুরুব্বীর প্রয়োজন অন্তরে অনুভব হয় তখন ভয় হয় না জানি আবার কোন বেদাতের পাঙ্কিলতায় হারিয়ে যেতে হয়। আলহামদুলিল্লাহ, যখন হযরতজ্বীর রচনাবলী, বক্তব্যমালা ও জ্ঞানের ভান্ডারের সন্ধান পেলাম তখন হাদীসের ব্যাপক উদ্বৃতি ও সুন্নাহর খাঁটি রঙ দেখে মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। তার ভারসাম্য, নিষ্ঠা, কট্টরত-।বিহীন বিনম্র পথচলা আমাকে প্রভাবিত করল। ভাবছি এমন একজন ব্যক্তির সাহচর্য খুঁজে পেতে অস্থির আছি বহুদিন। মালয়েশিয়ার এ জমায়েত আমার জীবনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। নতুন স্বাদে আল্লাহর প্রেম চেখে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছি। গাফিলতির নেশায় বুদ হয়ে থাকা অন্তর কিছুটা যেন জেগে উঠছে। আল্লাহর জিকিরের প্রশান্তি যেন লোভনীয় হয়ে উঠছে নিজের কাছে। নিরিবিলিতে প্রিয়ের সাথে বসে গল্পের চেয়ে জিকির করা, তাঁর মাহত্ম্য নিয়ে ভাবা যেন আরো আকর্ষণীয় এখন। প্রেমের এ সুর যিনি বাজাতে পারেন তিনি হলেন হযরত জুলফিকার আহমদ।

মালয়েশিয়ার এ মুলতাকায় অনেক সিনিয়র আলেম ও চিন্তাবিদদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের হযরত

মাওলানা বিজনুরী, পাকিস্তানের ইলিয়াছ গুমান, বাংলাদেশের মুফতি শামছুদ্দীন জিয়া, মুফতি মীজান সাঈদ, শায়খুল হাদিছ জাফর ঢালকানগর, মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নদভী প্রমুখ। একই রুমে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের অগ্রজ, উদার দৃষ্টিভঙ্গির মুয়াজ্জিন হযরত ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের সাথে। সুন্দর সময় কেটেছে তার সান্নিধ্যে।

ভারত ও পাকিস্তান হতে প্রকাশিত হযরতজ্বীর বহু কিতাব এ জমায়েতে এসেছে। তার শত শত কিতাব দেখে আমি বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে যাই। সময়ের এত বরকত পেয়ে কত না ধন্য তিনি। সময়কে কাজে লাগানোর এক অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে জেগে উঠে। মহান রব্বকে বলি, আমাদের প্রতিটি দিনকে বছরের মানে রূপান্তরিত করে দাও। এ মুলতাকায় হযরতের সব বইয়ের একটি সেট সংগ্রহের সুযোগ হল।

হযরতের রচনা সম্ভার ও বক্তৃতামালা কোরআন-সুন্নাহর প্রচুর উদ্বৃতিতে সমৃদ্ধ থাকে। বাস্তব ও আধুনিক দৃষ্টান্ত থাকে অহরহ। জানা আয়াত ও হাদীছের ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা হঠাৎ শিহরিত করে তুলে। ঘটনাবলীর অব্যাহত বর্ণনা শ্রোতাকে সহজে পুলকিত করে ও ভারী বিষয়কেও সাবলিল করে তুলে। খুবই সহজ সরল উপস্থাপনা যে কোন সাধারণ মানুষকে যেমন দূরে তাড়িয়ে দেয়না জ্ঞানী ও বোদ্ধারাও খুঁজে পায় বেশ নতুন মণি-মুক্তা। দেওবন্দ মাদ্রাসার উস্তাদ বিজনুরী বলেন- অনেকে প্রশ্ন করেন তিনিতো একজন ইঞ্জিনিয়ার, তিনি কি আলেম? আমি উত্তরে বলি, তার কোন্ বয়ান শুনে তোমার সম্ভারে নতুন কোন ইলম যুক্ত হয়নি সেটা আগে বলো? তিনি ইঞ্জিনিয়ার যেমন সত্য, তেমনি আলেম এবং হাফেজ সেটাও বাস্তবতা। আমেরিকায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যেমন উন্নত চাকুরি করছেন, তেমনি মানুষের আত্মার আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও তিনি সফলভাবে কাজ করছেন। তিনি একাধারে মেকানিক ইঞ্জিনিয়ার আবার রূহানী রাহবার ও ইঞ্জিনিয়ার। তার বয়ানগুলো সুরেলা নয়, কিন্তু চেতনা জাগানো। 'রাহে বেলায়েত', 'মাদারেজুসসুলুক', 'যুবদাতুসসুলুক', 'রাহে সালামত তোমহারা নিসবত' তাঁর অন্যতম প্রকাশনা। তার রচনাগুলো মূলত উর্দু ও ইংরেজিতে। ইদানিং তার প্রচুর বই বাংলায় অনুদিত হয়েছে এবং বেশ সমাদৃতও হয়েছে। তিনি উর্দু বয়ান করেন এবং ইংরেজিতেও লেকচার দেন।

একটি ঘোরের ভেতর দিয়ে কিভাবে তিনটি দিন কেটে গেল টেরও পাইনি। শেষের দিনটি ছিল আমার জন্য বেশ চমকের। এশার পূর্বে হযরতের শেষ বয়ান সমাপ্ত হল কান্নার এক রোলের ভেতর দিয়ে। তিনি উপসংহারে বললেন, আপনারা বিভিন্ন দেশে হতে সময় ও অর্থ ব্যয় করে এখানে এসেছেন। উদ্দেশ্য ছিল অনেক কিছু অর্জন করবেন। আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল খাঁটি, ত্যাগ ছিল নির্ভেজাল। কিন্তু দূর্বলতা ছিল আমার। আমি কিছু দিতে পারিনি। তবে সুযোগ পেলে আখেরাতে এ সাক্ষ্য দিবো যে, আপনাদের কোন ত্রুটি ছিলনা। কসুর ছিল আমার। তার এ বিনয়ী ও আবেদনময়ী বক্তব্য সকলের চোখগুলোকে করে তুলল অশ্রুসজল। অনুষ্ঠানের শেষে আল্লামা বিজনুরী দাঁড়ালেন আর বললেন, হযরতের পক্ষ হতে আজ তার প্রতিনিধি হিসেবে দশজন সৌভাগ্যবানকে পাগড়ি উপহার দেয়া হবে। পুরো মজলিসে উৎসুক্য। কার কার নাম বলা হবে? বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ঘোষনা হল। হঠাৎ আমি অবিশ্বাস্যভাবে শুনতে পেলাম ইউকে থেকে আমার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। আমার মাথা ঘুরে উঠল এ অসম্ভব চমকে। আমি হযরতের সামনে গিয়ে বসলাম। পাগড়ি পরলাম। মনে হল এটি একটি কাপড় নয় শুধু, ভারী কোন লৌহ পোষাক। যার ভার সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। হুলুলাংগেতে প্রথমদিন এসে পাহাড় ও মেঘের প্রেম দেখে যেমন হতভম্ব হয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি আল্লাহ প্রেমের নতুন সুর ও ঝঙ্কারে আমি আপ্লুত হলাম। ভালোবাসার নতুন স্পন্দন ও ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হলাম।

বিশ্বনবী-কালজয়ী আদর্শের মূর্ত প্রতীক

ডা. মোহাম্মদ ওমর ফারুক
সভাপতি, রাউজান ক্লাব ও জুনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি), জেনারেল হাসপাতাল, রাঙ্গামাটি।

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট ১২ রবিউল আউয়াল বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন মক্কার কুরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আল কাশিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। তিনি আকাশ-জমিনের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত সর্বশেষ নবী। মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এই মহান মানুষটির উপর। 'এ (কুরআন হচ্ছে) মানবজাতির জন্যে পথের দিশা, সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী (সূরা বাকারা আয়াত- ১৮৫)। অন্যত্র মহান রাব্বুল ইজ্জত বলেন, 'অবশ্যই কুরআন এক মর্যাদাবান গ্রন্থ, এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি (সযত্নে) রক্ষিত গ্রন্থে, যাদের পূত পবিত্র বানানো হয়েছে-তারা ব্যতিরেকে তা কেউই স্পর্শ করে না এবং (তা) নাযিল করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (সূরা আল ওয়াক্বেয়াহ, আয়াত- ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০)। বিশ্বনবী ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা। বেগুনাহ্‌গার আমার রাসূল (সাঃ) এর উক্ত বিশেষত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছেঃ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় জগতে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন। তিনি ধর্মীয় জীবনে যেমন সফল তেমনি রাজনৈতিক জীবনেও। সমগ্র আরব বিশ্বের অভাবনীয় জাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে তিনি সবচেয়ে অগ্রগামি। বিবদমান আরব জনতাকে একীভূতকরণ তার জীবনের অন্যতম সফলতা। সাইয়্যেদিনা হযরত জিবরাইল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ওহী নিয়ে আসেন তখন আমার রাসূল (সাঃ) ছিলেন হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানরত। তিনি দেখেন, বিশাল এক অবয়ব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে-যাঁর মাথা আসমানের নিচে ও পা জমিনে, তিনি তা দেখে এতটুকু বিচলিত হননি। ৪০ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্তির ৩ বছর পর রাসূল (সাঃ) প্রকাশ্যে ওহী প্রচার করেন। ওহী প্রচারের সাথে সাথে বিশ্বনবীর উপর নেমে আসে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। এরপরও এই মহান মানুষটি দমে যান্‌নি এতটুকু। তিনি জানতেন, ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি কুরাইশ বংশের কাফেরদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াতে হবে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা আরবদের কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের মূল হোতা কুরাইশ কাফেরদের নেতৃত্বের ভীত ধ্বংস করা ব্যতিত ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। রাসূল (সাঃ) এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। তিনি গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন ৩ বছর। সাফা পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সাঃ) চিৎকার করে প্রকাশ্যে বলেন যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল'। এ দূর্গম পথ পাড়ি দেওয়া আমার রাসূল (সাঃ) এর পক্ষে ছিল অত্যন্ত কঠিন। কুরাইশ কাফেররা বিভিন্ন প্রলোভন এর মাধ্যমে তাঁকে ইসলাম প্রচার থেকে দূরে রাখার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তাঁকে মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী মহিলা উপহার দেয়া, মক্কার নেতৃত্ব গ্রহণসহ অনেক লোভনীয় প্রস্তাব রাসূল (সাঃ) ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর চাচা হযরত হামজা (রাঃ) ও কুরাইশ নেতা ওমর ইবনুল খাত্তাব এর ইসলাম গ্রহণ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রকে অনেক প্রসারিত করেছিল। শে'বে আবু তালিবে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারী বনু হাশিম গোত্র জেল কেটেছিলেন ৩ বছর। এরপরে আমার রাসূল (সাঃ) এর জীবনে নেমে আসে ঘোর আঁধার। তাঁর প্রিয় সহধর্মিনী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) ও চাচা আবু তালিবের ওফাত। উক্ত দুই ঘটনার কারণে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে বিশ্বনবী হতাশ হয়ে পড়েন। এরপর মহানবী মক্কার দূরবর্তী শহর তায়েফ গমনে সিদ্ধান্ত নেন ইসলাম প্রচারের জন্য। নবুয়তের ১০ম শাউয়াল মাস, ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের শেষ অথবা জুন মাসের প্রথম দিকে নবী করীম তায়েফ গমন করেন। তিনি পায়ে হেঁটে তায়েফ আসা যাওয়া করেছেন। এসময় তাঁর সাথে ছিল মুক্তকৃত দাস জায়দ ইবনে হারেসা (রাঃ)। তায়েফ

যাওয়ার পথে তিনি যে গোত্রের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতেন সে গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন কিন্তু কেউ তার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। তিনি তায়েফে ১০ দিন অবস্থান করেন ও তায়েফের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে যান কিন্তু সবার একই কথা, 'তুমি এ শহর থেকে বেরিয়ে যাও।' সেখানে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি চূড়ান্ত অপমান, ক্রোধ ও উপহাসের স্বীকার হন-এমনকি তায়েফের লোকজন কিশোর তরুণদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর পিছনে লেলিয়ে দেন, তাঁরা রাসূলকে গালি দিত, তালি বাজাত। তারা ইট-সুড়কির আঘাতে আঘাতে প্রিয় নবীকে রক্তাক্ত করে দেয়, এতে তাঁর দু'পায়ের গোড়ালী রক্তাক্ত হয়ে জুতা ভিজে যায়, ওদিকে হযরত জায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) ঢাল হিসাবে তাঁকে আগলে রাখতেন। একসময় তিনি রবিয়ার দু' ছেলে উতবা ও সায়বার বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, এ বাগান তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ২০১৭ সালে তায়েফ ভ্রমনের সময় এ বাগানটি দেখার দূর্লভ সুযোগটা হয়েছিল। সেখানে আশ্রয় নেয়ার পর দূর্বৃত্ত বালকেরা ফিরে যায়। তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় বসে পড়েন। কিছুটা শান্ত হওয়ার পর তিনি দোয়া করেন- যা দোয়ায়ে মোসতাদয়াফীন-দুর্বলদের দোয়া নামে বিখ্যাত। এ দোয়ার প্রতিটি বাক্য থেকে বোঝা যায়, তায়েফবাসীর খারাপ ব্যবহার এবং তাদের কারো ঈমান না আনার কারণে রাসূল (সাঃ) কতটা মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। খ্রিষ্টান ক্রীতদাস আদাস রাসূল (সাঃ) কে আঙ্গুরের থোকা দেওয়ার পর তিনি বিসমিল্লাহ বলে হাত বাড়িয়ে তা খেতে শুরু করেন। কিন্তু তবুও তিনি হাল ছাড়েননি বরং সেখানেও তিনি ইসলাম প্রসারের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর বিশ্বনবী বাগান থেকে বেরিয়ে মক্কার পথে রওনা দেন। তিনি মানসিকভাবে ছিলেন ভীষন বিপর্যস্ত। তিনি কারনে মানাযেল নামক জায়গায় পৌছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আঃ) এলেন, তাঁর সাথে পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেস্তারাও ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করেন, অনুমতি দিলে তায়েফের অধিবাসীদের দু' পাহাড়ের মাঝখানে রেখে পিষে দিবেন। তিনি বললেন, না, আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওহুদের দিনের চেয়ে কঠিন কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? তিনি বললেন, তোমার কওম থেকে আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল তায়েফের বিপদ। এছাড়াও তাঁর প্রিয় সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রাঃ)র ওফাতের ঘটনা আমার রাসূল (সাঃ) কে সারা জিন্দেগী কাঁদিয়েছে। আমার রাসূল বলতেন, 'কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না, পিতা পুত্রকে চিনবে না, মা তার সন্তানকে চিনবে না, পীর তার মুরীদকে চিনবে না, সেদিন আমি যেন আমার খাদিজাকে চিনতে পারি।' আমার রাসূল (সাঃ) যখন ঘরে ফিরতেন তখন ডাক দেয়ার সাথে সাথেই হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর উপস্থিতি জানান দিত। হযরত খাদিজা (রাঃ) বলতেন, রাসূল (সাঃ) এর ডাকে যেন আমি সাথে সাথে সাড়া দিতে পারি-সেজন্যে দরজাকে বিছানা বানিয়ে জেগে থাকি। আমার রাসূল (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ) কে এত ভালবাসতেন যে, খাদিজার কথা বলতেই তিনি কেঁদে দিতেন। হযরত মা আয়েশা সিদ্দিক (রাঃ) একবার বলেই ফেলেছিলেন, হে রাসূল (সাঃ) কোন্ জাহেলী এক যুগের বুড়ী মহিলাকে আপনি বিয়ে করেছেন-তার জন্য এখনো আপনার মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) প্রচন্ড রেগে গিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত ততটা ঈর্ষা নবী করীম (সাঃ) এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি হত না। (অথচ) নবী করীম (সাঃ) আমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি (খাদীজা) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এর কারণ হল, আমি নবী করীম (সাঃ) কে প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতে শুনতাম এবং আল্লাহ নবী করীম (সাঃ) কে আদেশ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে (খাদীজাকে) পরকালে একটি মণিমুক্তা খচিত প্রাসাদের সুখবর দান করেন। আর (নবী করীম (সাঃ) এর অভ্যাস ছিল) যখনই তিনি বকরী যবেহ্ করতেন তখনই তা হতে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ (গোশত) হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করতেন (সহিহ্ বোখারী শরীফ -৩৫৩৭)।

পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে

এ আর বাহাদুর বাহার
বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী

প্রায় আড়াই যুগ আগের কথা। তখন কক্সবাজারসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাস ছাড়ত নিউ মার্কেট এলাকা থেকে। চট্টগ্রাম শহরের জলসা সিনেমার (সিনেমা হলটি বর্তমানে নেই) মোড় থেকে আমতল পর্যন্ত বাসের দীর্ঘ সারি থাকত। জলসা সিনেমার উত্তর পাশে বেড়ার তৈরী ছোট ছোট টুকরী দোকানসমূহ নিয়ে হকার মার্কেট ছিল।

বিড়াল যেমন ছা নাড়ে বার বার, আমাদের দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাস ষ্টেশনও চট্টগ্রাম শহরে বার বার নড়েছে। কখনও আন্দরকিল্লা সিটি কর্পোরেশন অফিসের সামনে কখনও প্যারেড মাঠের পূর্ব পাশে নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোডে, কখনও খুরশিদ মহলের সামনে থেকে, কখনও বহদ্দারহাট মসজিদের পশ্চিমে রওশন বোর্ডিং বরাবর ছিল। যাই হোক বাস স্টেশন যখন জলসা সিনেমার সামনে ছিল সে সময়ের কথা বলছি।

একদিন সাতকানিয়া থেকে শহরে এসে কাজ শেষে বাসে করে ফিরে যাচ্ছিলাম গ্রামে। বাস জলসা সিনেমার পাশ থেকে ছেড়ে জুবলী রোড হয়ে আলমাস সিনেমার সামনে দিয়ে ওয়াসার মোড়ে বের হত। আমাদের গাড়ি যখন কাজির দেউরি চার রাস্তার মোড় পার হচ্ছিল তখন রাস্তার বামে পশ্চিম পাশে যে অংশে সার্কিট হাউস আছে সেই অংশে কোণাকোণি বিশাল এক সাইন বোর্ড ছিল। দেখলাম সাইন বোর্ডের মধ্যখানে একটি ছবি, ছবির উপরে অথবা নীচে সুন্দর অক্ষরে লেখা ছিল "পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে"!

ছবির সাথে সাইনবোর্ডে লিখিত কথার এতই অপূর্ব মিল ছিল যে ছবি দেখার পর লিখাটা পড়ে আমার কঁচি মনের কলিজায় চিৎকুর করে একটি কামড় দিয়ে বসল। আমি প্রচন্ড শক্ খেলাম!

সাইন বোর্ডের ছবিতে মধ্যখানে পৃথিবীর গোলাকার অবয়ব গ্লোব অংকিত ছিল। সেই অংকিত গ্লোবাল বিশ্বকে বেষ্টন করে ছিল একটি লম্বা বিশাল আকৃতির সাপ। সাপটি পৃথিবীকে চারিদিকে বেষ্টন করে নিজের হা করা মুখের ভিতর নিজের লেজটিকেই খেয়ে ফেলছিল।

দৃশ্যপটের ফলাফলটি এমন ছিল যে সাপটি লেজের অংশ থেকে যতই গ্রাস করছিল পৃথিবী যেন ততই ছোট হয়ে আসছে। এটা বুঝতে পেরেই আমার কলিজায় চিৎকুর করে কেউ যেন কামড় দিয়েছিল। আমার স্বার্থপর অবুঝ মনটা এই চিন্তায় অস্থির হচ্ছিল যে আমি বড় হয়ে পৃথিবীতে বসবাস করার জায়গা পাবো তো? আমি বড় হয়ে বিয়ে-শাদী করে সন্তানাদী নিয়ে কোথায় থাকবো যদি পৃথিবী এভাবে ছোট হয়ে যায়?

এর প্রায় দশ বছর পর অবশ্য পৃথিবী ছোট হবার রহস্য কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম বলে মনে হয়েছিল।

মুরব্বীদের কাছে শুনেছি যোগাযোগের মাধ্যম গাড়ি যখন রাস্তায় নামেনি তখন পায়ে হেটে বা নদীতে নৌকায় চড়ে দূর পাল্লার পথ পাড়ি দিতে হত। চট্টগ্রাম শহরে যাবার জন্য সকালে কলাপাতার মোড়কে ভাতের মৌচা নিয়ে বের হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ৪০ মাইল দূরে শহরে গিয়ে পৌছত। গাড়ি বের হওয়ার পর যখন ঐ একই দূরত্ব ৩ ঘন্টা সাড়ে ৩ ঘন্টায় পৌছা যেত তখন বুঝতে পেরেছিলাম পৃথিবী ছোট হবার রহস্য।

আমাদের এলাকার একজন আলাউদ্দীন চাচা ছিলেন স্বচ্ছল কৃষক। সেবার বন্যার প্লাবনে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হওয়ায় দারিদ্রের কষাঘাতে দেশে টিকতে না পেরে হেঁটে হেঁটে সৌদি আরব যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিলেন, তবে হেঁটে হেঁটে সৌদি আরব যেতে সময় লেগেছিল ৬ মাস। পরে ঐ আলাউদ্দীন হাজি পরিবারের সবাইকে সৌদি আরব নিয়ে গিয়েছিলেন। এখনও উনার ছেলেরা সৌদি আরব থাকেন।

সেই ৬ মাসের পথ সৌদি আরব এখন বিমানে ৬ ঘন্টায় যাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি পৃথিবী ছোট হচ্ছে না? তখন দেখেছি বিদেশ থেকে একটি চিঠি আসতে ১৫ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লেগেছে। আর এখন? চিঠির ডিজিটাল রূপ এসএমএস, এমএমএস আদান-প্রদান হচ্ছে চোখের পলকে। এসএমএস তো দূর ছাই,

ভিডিও কল সব দূরত্বের পর্দা নিমিষে দূর করে দিয়েছে। উঠোনের মাটিতে ছোট ছোট মেয়ে ছেলেরা খেলা করলে মায়েরা ঘর থেকেই তাদেরকে নজরে রাখে। আর বর্তমানে সন্তান বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন সন্তানের সাথে সরাসরি চোখে চোখ রেখে কথা বলা যাচ্ছে। সিনেমা হল চলে এসেছে হাতের মুঠোর ভিতর। পৃথিবীর সেরা সেরা লাইব্রেরীর সমস্ত বই চলে এসেছে চোখের সামনে। পৃথিবী কতো ছোট হয়ে গেল!

আল্লাহর দেয়া বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান আমরা ব্যবহার করছি আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার পন্থা হিসেবে। আমার আল্লাহ রহমানুর রহীম তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীকে ছোট করে আমার বসবাসের স্থানকে সংকোচিত করেননি। বরঞ্চ পৃথিবীর স্বপ সময়ের হায়াতে জীবনকে যেন পরিপূর্ণ রূপে উপভোগ করা যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের জীবন-যাত্রা উন্নয়নের ধাপগুলোকে সুপারনোভা গতিতে ডেভেলপ করে দিয়েছেন। আর আমরা মানুষেরা আল্লাহর না শোকরি তো করছিই শুধু নয়, আল্লাহর সিফাতের সাথে কাউন্টার হয়ে দাঁড়াবার সাহস দেখাচ্ছি!

আমাদের আত্নীয়-বন্ধু-পরিজনের পাঠানো এসএমএস সমূহ আমরা গুরুত্বের সহিত ঠিকই রিপ্লাই করি। কিন্তু আল্লাহপাকের পাঠানো হাজার হাজার এসএমএস (আসমানী মেসেজ) আমরা রিপ্লাই তো দুরের কথা বুঝে পড়াটাও কর্তব্য মনে করি না।

সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে পাঠানো সেই এসএমএস সমূহ কিছু কিছু লোক অনর্গল পাঠকরে গেলেও বুঝে পাঠ করার লোক খুবই নগন্য। এ অবস্থায় বুঝতে পারছি না পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে নাকি আমাদের মন-মানসিকতা ছোট হয়ে আসছে। নাকি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপলব্ধি ছোট হয়ে আসছে?

মানুষ শব্দের অর্থ কি? যতদুর জেনেছি মানসম্মত হুস যার তিনিই মানুষ। তাই যদি হয় আমাদের হুস কি মানসম্মত আছে ?

মূল্যায়নের ভার আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম।

দি-আদি চট্টগ্রামের টেইলারিং জগতে এক জনপ্রিয় নাম...

পাঞ্জাব টে ই লা র্স

পাঞ্জাবী, কাবুলী ও বোরকা স্পেশালিষ্ট

বিঃদ্রঃ আমরাই আন্দরকিল্লায় সর্বপ্রথম...

মোঃ নাসির উদ্দিন
প্রোপ্রাইটর
০১৭১৬ ০৬৪৬৪৫
০১৮২৬ ৬৪৬১৮৩

দি-আদি পাঞ্জাব টে ই লা র্স এর নকল বের হয়েছে
নকল এড়িয়ে চলুন

আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

৩২ নং, মসজিদ মার্কেট
(মাঝখানে-২য় তলায়), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-২৮৬৯৩১৫

নিবন্ধ

মানুষ একটি ছোট্ট পৃথিবী

জহির তানভীর
শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় সেমিস্টার, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি

সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে কত কিনা সৃষ্টি করেছেন মহান প্রভু। সেই সপ্ত আকাশ থেকে নিয়ে সপ্ত স্তরের জমিনের মধ্যবর্তী সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন এই মহান খালিক। কত মহাদেশ, মহাসাগর, গ্রহ, উপগ্রহ, মহাকাশ, সৌরজগতের অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন এই ইহকাল। জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, আরশ, পুলসিরাত, হাউজে কাউসারের মত কল্পনাতিত সৃষ্টির মাধ্যমে বানিয়েছেন পরকাল। যে দুটি জগতে রয়েছে মানুষ, জ্বীন, ফেরেশতা, আকাশ-জমিন, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা-গিরিখাত, মরুভূমি-উপকূল, ঝরনা-ফোয়ারা, হাওর-বন্দর, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, ফুল-ফল, আরো কত অপরূপ সুন্দর সৃষ্টি! সবকিছুকেই অভিনব রূপ দিয়েছেন, দিয়েছেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য।

মোটকথা তিনি এই পৃথিবীকে বিচিত্রময় করে সৃষ্টি করেছেন। অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছেন, চিত্তাকর্ষক অংকন শৈলী দ্বারা সাজিয়েছেন এই ক্ষণস্থায়ী রঙিন দুনিয়াকে। যাদুময়ী, চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যের দ্বারা সজ্জিত করেছেন এই অপূর্ব ধরণীকে। বলতে গেলে এই পৃথিবী হলো একটি ঘরের মতো, যার উপরে ছাঁদ হিসেবে দিয়েছেন আকাশ, নীচে বিছানা হিসেবে দিয়েছেন জমীন, আর ভিতরে আসবাবপত্র হিসেবে করেছেন কত অসংখ্য ও অগনিত, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টির আয়োজন, যার সাময়িক ব্যবহারকারী ও ভোগকারী, সংরক্ষণকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হলো মানুষ। যার প্রতি তাকালেই নয়ন সিক্ত হয়ে যায় নীল আকাশের দর্শনে। কর্ণকুহর মুখরিত হয়ে যায় পাখির সুমধুর গুঞ্জনে। মন ভরে যায় সমুদ্রের ভেসে আসা কলতানে। হৃদয় জুড়িয়ে যায় দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহে। ভাবনার অতল সাগরে ডুবে যেতে হয় যার ক্ষুদ্র বস্তুর গবেষণাতে।

শত রূপে রূপবন্ত এই ধরনীতে বসবাস করে এক রূপবান প্রাণী মানুষ, যার প্রাণের বিনাশ আছে তবুও রূপের শেষ নেই। যার জীবনের শেষ আছে তবুও কামনার শেষ নেই। ভরসা নেই এক সেকেন্ডের কিন্তু স্বপ্ন দেখে শত বছরের। আবাস হবে মটির নীচে তবুও প্রাসাদ উঠাতে চায় আকাশের উপরে। আর তারাই হলো প্রভুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তারাই সবচেয়ে জ্ঞানী। তাদেরই রয়েছে ভালো-মন্দ বুঝার শক্তি। তাদের জন্যই মহান প্রভুর এতো আয়োজন। তাদের জন্যই ফেরেশতাদের মধ্যে করেছেন বিয়োজন। আর এই পৃথিবীতে বাসকারী মানুষকেও বলা যেতে পারে ছোট্ট আরেকটি পৃথিবী। কারণ এই ধরনীকে নিয়ে গবেষণা করার মতো তাদেরকে নিয়ে গবেষণা করলেও উদঘাটন করা যায় আল্লাহর এতো কিছু সৃষ্টির রহস্য কি! কথিত আছে যে, মানুষ যদি নিজেকে নিয়ে গবেষণা করে তাহলে সে এই বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে।

তেমনি তাফসীর গ্রন্থাবলীর মাঝে ঐতিহাসিক তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে বায়যাবীতে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত الحمد لله رب العالمين এর العالمين শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উক্ত তাফসীর গ্রন্থের মুছান্নীফ কাজী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল বায়যাবী রহঃ শব্দটির এক ব্যাখ্যায় বলেন এখানে عالم মানে হলো মানুষ। সারা বিশ্ব হলো একটি বড় পৃথিবী আর প্রতিটি মানুষ হলো একটি ছোট্ট পৃথিবী। এটাকে বুঝাতে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, পৃথিবীতে যেমন সাগর, নদী-নালা আছে এবং এগুলোতে রয়েছে পানি, মাছ, প্রাণী ও আরো কত কিছু। তেমনি মানুষের দেহেও এগুলো রয়েছে, আর তা হলো তার নাড়িভুঁড়ি, শিরা-উপশিরা ও এগুলোতে থাকা পানি, রক্ত, জীবাণু ও কীট ইত্যাদি। পৃথিবীতে যেমন রয়েছে ঝর্ণা তেমনি মানুষের রয়েছে চক্ষু। পৃথিবীতে যেমন রয়েছে পাহাড় তেমনি মানুষের রয়েছে উঁচু হাড়। পৃথিবীতে যেমন রয়েছে বন-জঙ্গল ও এগুলোতে নানান ধরনের প্রাণী তেমনি মানুষের রয়েছে মাথার চুল ও এগুলোতে থাকা উকুন সহ নানান জীবাণু। পৃথিবীতে যেমন রয়েছে গাছপালা, তেমনি মানুষের শরীরে রয়েছে চুল। পৃথিবী যেমন সমতল তেমনি মানুষের দেহটাও প্রায় সমতল, সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পৃথিবীকে যেমন সামান্য মাটি থেকে সৃষ্টি করে পানির মাধ্যমে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে তেমনি প্রতিটি মানুষকেও সামান্য পানি থেকে সৃষ্টি মাটির দেহে বড় করা হয়েছে। ইত্যাদি নানান বর্ণনায় তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে মানুষও পৃথিবীর মতো, পৃথিবীতে যা কিছু আছে মানুষের মাঝেও সেগুলোর সমপর্যায়ের বস্তু রয়েছে। তাই মানুষকে নিজেকে নিয়ে গবেষণা করা মানে বিশ্বকে নিয়ে গবেষণা করা।

মসজিদের কান্না

নাইয়েরা হামীম
শিক্ষার্থী, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি

নামাজ শুরু হয়েছে এখন। সব ব্যস্ততা বাদ দিয়ে নামাজ পড়তে মসজিদ পানে এসেছে সে। মুয়াজ্জিন ইকামাত শেষ করলে ইমাম তার তাকবীর ধ্বনিতে নামাজ আরম্ভ করল। সেও দেরি না করে ইমামের পেছনে নিয়ত বাঁধল। সে ফ্যানের চেয়েও দ্রুত গতিতে চলছে। নামাজ শুরুর সাথে সাথে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল বাড়ির দিকে। এখন বাজার থেকে আনা জিনিসের হিসাব কষতে লাগল, কারণ মাকে হিসাব দিতে হবে। আবার বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে এসে দেখল, ইমাম সাহেব রুকুতে চলে যাচ্ছে। মুহূর্তেই চলে গেল আজ ক্লাসের আড্ডায় (একটু মুচকি হেসেও ফেলল)। আবার দেরি না করে ফিরে এসে ইমামের সাথে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যায়। এবার দাঁড়ানো থেকে সিজদায় যাওয়ার আগে আবার চলে গেল ফয়েজ লেকে। মুহূর্তেই আবার ফিরে এল। এভাবে অনেক কষ্টে প্রথম রাকাত শেষ করে। বাকি থাকে আরো তিন রাকাত। এরি মাঝে হয়ে যায় হালকা গোল টেবিল বৈঠক। একিভাবে বিশ্বের আনাচে-কানাচে শত-হাজার ব্যস্ততা-চিন্তা ঘুরেফিরে আবার আসে নামাজে। কোনরকম ইমামের সাথে নামাজ শেষ করে সেও অন্যদের মত বেরিয়ে যায়।

হ্যাঁ! আমি এতক্ষণ দুষ্ট মনের কথা বলছি। কী আজিব ব্যাপার! আমরা এভাবেই কাজকে নামাজের ভিতর সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। তাই নামাজে মনকে স্থির রাখা কঠিন ব্যাপার। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন, যখন সালাতের জন্য আজান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে। যাতে সে আজানের শব্দ না শুনে। যখন আজান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার আসে। আবার যখন সালাতের জন্য ইকামত দেয়া হয় তখন আবার দূরে সরে যায়। এবার এসে সে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর। বিভিন্ন বিষয় মনে করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাকাত সালাত আদায় করেছে তা মনে রাখতে পারে না। (বুখারী হাদিস-৬০৮)

কবি আল্লামা ইকবাল (রঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের মত মুসল্লী না পেয়ে, আজ মসজিদগুলো কাঁদছে।

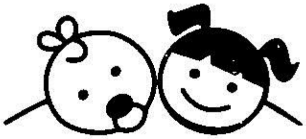

BABY-MART

গার্লস আইটেম

কটন ফ্রক, ইন্ডিয়ান লেহেঙ্গা, পার্টি ফ্রক, স্কার্ট, ওয়েস্টার্ন ডিভাইডার সহ দেশী-বিদেশী আধুনিক সব ডিজাইনের বিপুল সমাহার।

বয়েজ আইটেম

ফতুয়া, শার্ট, টি-শার্ট, পাঞ্জাবী, গেঞ্জী সেট, শেরওয়ানী, র‍্যাম্পার, সিঙ্গেল প্যান্ট সহ ছেলেদের বিভিন্ন ব্র্যান্ড কালেকশন।

নবজাতক বাচ্চাদের নিমা, ন্যাপি, টিস্যু ডায়াপার, বেডসেট, মশারী, ফিডার, রেকসিন, কাঁথা, বেবী বাথটাব গিফটবক্স সহ নিত্যনতুন সব কালেকশন। আরো থাকছে বাচ্চাদের নজরকাড়া খেলনা সামগ্রী।

৩১,৩২,৩৩/সি গুলজার টাওয়ার (নীচ তলা), চকবাজার, চট্টগ্রাম। ০১৮১৫ ৬০৬২৩৩

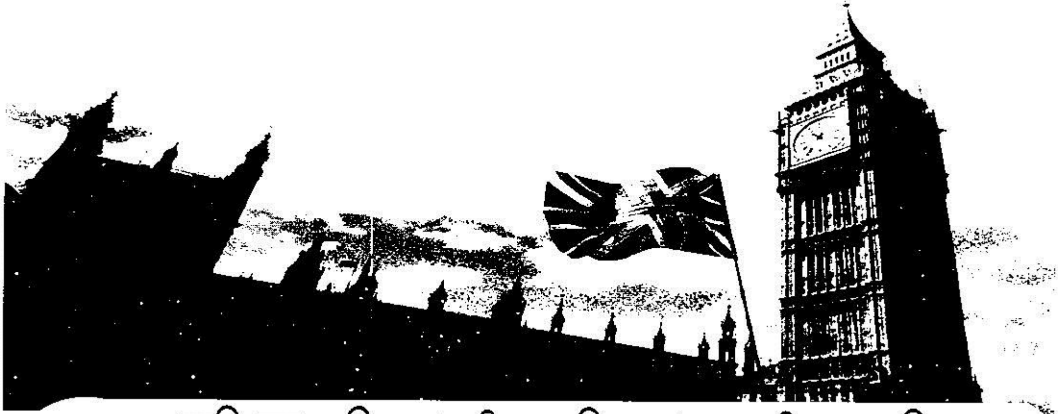

আমি কেন ও কীভাবে 'খৃষ্টান-কাফিরদের' দেশ বৃটেনের নাগরিক হলাম

ড. আবুল কালাম আজাদ
লেখক : বিশিষ্ট গবেষক ও দাঈ ইলাল্লাহ, লন্ডন
সাবেক শিক্ষক, কুরআনিক সাইন্স অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি

এই জটিল প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে আমার এই সাধারণ জীবনের কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাকে একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে।

ছোট বেলা থেকেই আমি একটু বাধন-শিথিল-উড়ু উড়ু মনের ছিলাম। এক জায়গায় গাট ধরে বসে থাকা আমার জন্যে অনেক কষ্টকর ছিলো। এখনো তা কষ্টকর লাগে।

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের যশোর জেলার লাউড়ী গ্রাম ও গ্রামের বিশাল বিখ্যাত লাউড়ী মাদ্রাসা থেকে অনেকটা পালিয়ে যাই ঢাকার যাত্রাবাড়ীর মির হাজিরবাগে তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায়। তখন মনে হয়েছিল, যেন একটা বস্তি ঘেরা জ্ঞানের ফুলবাগানে এলাম।

এরপর কামিল হাদিসে পড়তে ঢাকার বকশী বাজার ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় এলাম। এখানকার মূল আকর্ষণ ছিলেন শায়খ ফখরুদ্দীন, শায়খ মকদ্দস আলী, শায়খ আব্দুর রহিম, শায়খ ওজিহ উল্লাহ ও শায়খ আব্দুল হক।

আমার যাযাবর জীবন এখান থেকে আরো একধাপ নিয়ে ফেলে দিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ বিশাল ময়দানে। ভালো লাগত। কারণ দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, সেরা আরবিবিদদের স্নেহের ছাত্র।

আমাকে এখানে যারা সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. আব্দুল মাবুদ, প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান ও প্রফেসর ড. আবু বকর সিদ্দিক। ড. মুস্তাফিজ স্যার ক্লাসের প্রথম থেকেই আমাকে মনে হয় একটু স্নেহ করতেন কারণ আমি ঢাকা আলিয়া থেকে এসেছি, সারা দেশে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি, আরবিতে কথা বলতে পারি, উনার কাছাকাছি থাকি। একবার আমি ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে একটু অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি স্যারকে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

চিঠিতে লিখেছিলাম- স্যার, আপনার একটা ক্লাস থেকে মাহরূম হওয়া মানে অনেক কিছু থেকেই মাহরূম হওয়া মনে করি। দোয়া করবেন, যেন সুস্থ হয়ে আগামী সপ্তাহেই আপনার ক্লাসে যোগ দিতে পারি। ফিরে আসার পর স্যার বলেছিলেন, আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একজন ছাত্রই পেলাম যে, অসুস্থ হয়ে অনুপস্থিত হয়েও আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে। স্যার এই চিঠি পেয়ে খুবই সম্মানিত বোধ করেছিলেন।

আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা ছিলো বেশ আয়েশী ও বর্নাঢ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ার পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেলাম। সেখানে গিয়ে চার বছর পড়লাম আরবি ভাষা সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষার ওপর।

কোন সন্দেহ নেই যে, মদীনায় এসে পৃথিবীর সেরা সেরা আরবি প্রফেসরদের পেয়ে মনটা ভরে গেলো। তাদের অধিকাংশই ছিলেন মিশরের আল আযহার

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। উনারা ছিলেন আসলেই আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সাগর। এখানেই পেলাম আকীদা, কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের অনেক আরবী-সৌদি শিক্ষক।

আমরা যে বছর অনার্স শেষ করলাম সে বছর আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকে কাউকেই মাস্টার্স এ নেওয়া হয়নি। সৌদির বা আমার পছন্দের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি না পেয়ে বাংলাদেশে চলে এলাম।

এসে তামিরুল মিলাত মদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করলাম। ওখানে থাকা অবস্থায় মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিসহ পড়ার সুযোগ পেলাম।

আড়াই বছর পর, আমাদের ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ড. জামাল বার্জিন্‌জী আমাকে ওখানে চাকরির অফার দিলেন। ওখানে ইস্তাক নামের আরেকটি সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পিএইচডিরও একটা অফার পেলাম। কিন্তু মূলতঃ দেশের টানে ও দেশেই কিছু করার আশায় ওসব অফার ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এলাম বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি)তে।

এখানে কুরআনিক সাইন্স বিভাগে আড়াই বছর পড়ানোর পর বৃটেনে পিএইচডি করার জন্যে একটা বৃত্তি পেলাম।

এই বৃত্তি পাওয়ার পেছনে তিনজনের অবদান অনস্বীকার্য- প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রফেসর ড. সালমান নদভী ও ইংল্যান্ডের প্রফেসর ড. মানাযির আহসান।

আইআইইউসি থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে ছুটলাম এই কাফিরের দেশে।

বৃটিশ দূতাবাসে আমার ইন্টারভিউ নেন এক কালো ভদ্র মহিলা। আমি বলেছিলাম যে, আমি ইসলামী আইনের ওপর পিএইচডি করতে যাচ্ছি (কিন্তু করেছি এডুকেশান- স্কুল ম্যানেজমেন্টে)। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ইসলাম পড়তে আমি আরব দেশে না গিয়ে ইংল্যান্ডে কেন যাব। খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্ন। আমি এর কী উত্তর দেই তার ওপর নির্ভর করবে আমার ভিসা পাবার রেটিং। আমি বলেছিলাম- বৃটেনের গবেষণার মান আরব দেশের চেয়ে উন্নত। আর আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে কিছু প্রফেসর আছেন যারা আরব-ইসলামী বিশ্বসহ পশ্চিমা বিশ্বেও পরিচিত। আর আমি তো স্কলারশীপও পেয়েছি।

উনি আরো জানতে চেয়েছিলেন, আমি পিএইচডি শেষ করে কী করব?

আমার সোজা উত্তর ছিলো- আমি আবার দেশেই ফিরে আসব। কারণ, আমি বাংলাদেশেই কিছু করতে চাই। এটা শুধু ভিসা পাওয়ার জন্যে বলিনি, বলেছিলাম, আমার মনের কথা। বিশেষ করে, আমি আইআইইউসিকে কখনো ছাড়তে চাইনি। কারণ, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষক হিসাবে এটা আমার কাছে ছিলো (এখনও আছে) আমার পরিবারের মত। সেই সময়ে আমরা শিক্ষকরা ছিলাম খুবই আপন বন্ধুর মত। আমার উত্তরে ভিসা অফিসার কতটুকু খুশি হয়েছিলেন জানি না।

তবে, পরেরদিন যখন ভিসা আনতে যাই তখন বৃটিশ হাইকমিশনের এক বাংগালী অফিসার বলেছিলেন- বৃটিশ অফিসার নাকি আমার ভিসা দিতে চাইছিলেন না। উনি তাকে ভিসা দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। আমি উনার নাম জানতে চাইলেও বলেননি। শুধু বলেছিলেন- আমার জন্য দোয়া করবেন।

বৃটেনে আসার জন্যে আমাকে যারা বেশী উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুস সালাম আজাদী ও লন্ডনের আব্দুল বাতেন ভাই।

আমি ভিসা পাবার পর আইইউসিতে ফিরে এলাম। কাতালগঞ্জে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে দেখা। তিনি অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজীতে এম এ করেছেন।

আমি ইংল্যান্ডে পিএইচডি করতে যাচ্ছি, উনাকে বললাম। তিনি এ খবর শুনে খুশী হয়েছিলেন কি না বুঝতে পারিনি। তবে, জিজ্ঞেস করেছিলেন- এ তরী কি এদিকে ফিরবে আর?

আমি বলেছিলাম- স্যার, আশা তো করি। তবে, বাতাস যদি এ দিকে বহে তাহলে তো তরী এদিকেই ফিরবে, ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আসলে তো কালামের তরী আর আইআইইউসি'র দিকে ফেরেনি, ফেরেনি বাংলাদেশের দিকেও।

যে লোকটা মালয়েশিয়ার মত সুন্দর মুসলিম দেশের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ছেড়ে বাংলাদেশের একটা নতুন ছোট্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য বেতনের চাকুরী করত, সেই লোকটা কেন একটা অমুসলিম দেশে রয়ে গেল, সেটা একটা ইতিহাস।

এই দেশে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা আমার একদমই ছিলো না। কিন্তু কোন কারণে আমাকে এমন একটা ঐতিহ-াসিক সিদ্ধান্ত নিতে হলো সেটা আমার বিলেতের দীর্ঘ দিনের প্রবাসী জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বুঝা যাবে।

আমি যেদিন প্রথম লন্ডনে নামলাম, হিথ্রো এয়ার পোর্টে বের হয়ে দেখি আমার জন্যে কেউ অপেক্ষায় নেই। কারণ, আমি কোন দলের কর্মী বা নেতা ছিলাম না। না ছিলাম কোন পীরের মুরিদও। তাই যিনি আমাকে রিসিভ করবেন বলেছিলেন, তিনিও আসেন নি।

আমি এয়ার পোর্টে একটু উদভ্রান্তের মত ঘুরছি। এমন সময় এক আফগানী লোক এসে বললেন- আপনার কোন হেল্প লাগবে?

আমি বললাম, আমি তো আসলে যাব লেস্টারে, একজন আমাকে এসে নেওয়ার কথা ছিলো কিন্তু আসেনি। কীভাবে যাব বুঝতে পারছি না।

উনি বললেন, চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে লন্ডনে নিয়ে লেস্টারের কোচ ধরিয়ে দেব। এখন তো রাত প্রায় আটটা বেজে গেছে। লেস্টারের কোচ না থাকলে আমার বাসায় আপনি রাত থাকতে পারবেন, সকালে আমি আবার এখানে পৌঁছে দেব, ইনশাআল্লাহ।

আমাকে ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশনে এসে গাড়ি পেয়ে গেলাম।

প্রায় আড়াই ঘন্টা লাগবে।

গাড়িতে সামনে বসেছিলেন এক মুসলিম মহিলা।

উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম মার্কফিল্ড উনি চেনেন কি না। বললেন হ্যাঁ, চিনি। আপনি একটা ক্যাব নিয়ে চলে যেতে পারবেন।

কোচ থেকে নেমে ক্যাব লাইনে গিয়ে ঠিকানা দেখালাম ড্রাইভারকে, বললেন, উঠুন।

রাতের বেলায় একা একা ক্যাবে চড়ে আছি। আমার কাছে প্রায় চার লাখের সমান পাউন্ড আছে। দেশ হলে তো ক্যাবওয়ালা এমনভাবে একা পেলে আমার কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে ভেগে যেত।

ইয়া, আল্লাহ! মার্কফিল্ড তো একটা নিঝুম গ্রামের মত। আমাকে ক্যাবওয়ালা যেখানে নামিয়ে দিলেন সেটা একটা বেশ বড় ক্যাম্পাস।

কিছুক্ষণ পরেই একজন যুবক এলেন। আমার পরিচয় দিলাম। বললেন, আমি আব্দুর রহমানকে ডেকে নিয়ে আসি। আমাদের আইআইইউসি এর ভিসি সাহেবের পিএ আমার কিছুদিন আগেই এখানে এসেছেন একটা ট্রেনিং এ। আব্দুর রহমান ভাইও দ্রুতত বের হয়ে এলেন। তা না হলে আমার একটু বিপদ ছিলো। কারণ উনি কি এক ভংগিতে যে ইংরেজি বলছিলেন, তা আমি সব বুঝতে পারছিলাম না। তার কথা ছিলো খুব দ্রুত ও ভাংগা ভাংগা।

আব্দুর রহমান ভাই বললেন, চলেন আপনার রুমে যাই। আমি চাবি নিয়ে রেখেছি।

ছোট্ট এক বেডের রুম। কিন্তু একটা বেসিনসহ চেয়ার টেবিল আলমিরা সব আছে। রুমে একটা জায়নামাজ, ও কুরআনও পেলাম। খুব ভালো লাগলো। এটা একটা ইসলামী পরিবেশ। এটা ছিলো পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা এফিলিয়েটেড ইন্সটিটিউট। আব্দুর রহমান ভাই বললেন, আপনার জন্যে রাতের খাবার রেখেছি।

এখানে একটা মাঝারি সাইজের বসার ঘর আছে। ওখানে ওভেনে খাবার গরম করে খেলাম।

আব্দুর রহমান ভাই বললেন, এখন ঘুমান, আমি ফজরের দিকে ডেকে দেব, মসজিদে নামায পড়তে যাব।

এই কাফির দেশে এসে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়তে পারব জেনে আমার অসম্ভব ভালো লাগলো।

বেডে এলাম। কিন্তু একি? ঘুম আসছে না যে! কত লম্বা সফর, বেশ ক্লান্ত। এরপরও ঘুম আসছে না যে! কেন? বুঝেছি, আমার পাশে নেই একটা বিলাই ছানা ও বালিশ মোবারক! জীবনের কিছু সময়ের নিরবতার মাঝে এই দুই প্রজন্মের সঙ্গ ও স্পর্শ খুবই আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়।

চলবে...

শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ইসলামের নির্দেশনা

আবু যোবায়ের
শিক্ষার্থী, হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

শীত এসে গেছে। শীতের দাপট ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে হিমশীতল কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে দেশ। শীত বিত্তবান মানুষদের জন্য যেমন আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে, তেমন 'দিন এনে দিন খাওয়া' বস্ত্রহীন মানুষদের জন্য একটি গরম কাপড়ের হাহাকার নিয়ে আসে। কবির ভাষায় 'কুয়াশার মহাসমীরণে জেঁকে বসে আবহমান গ্রাম-বাংলা। এ চিরায়ত সত্যের বুকে সুখ-দুঃখ এক সুত্রে গাঁথা মানুষের এক টুকরো গরম কাপড়ের জন্য উন্মুখ চেয়ে থাকা।' আমাদের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। অনেকেরই শীতের সময় প্রয়োজনীয় গরম কাপড় কিংবা কম্বল কেনার সামর্থ্য হয়না। বিশেষ করে পথশিশু ও ছিন্নমূল মানুষরা। ওদের কষ্ট সবচেয়ে বেশি। খোলা পরিবেশে নিদারুণ শীতে কাঁপতে থাকে কঙ্কালসার দেহ। ফিনফিনে পাতলা কাপড় ভেদ করা হিম শীতল বায়ুতে জমে যায় রুগ্ন শরীর। নির্ঘুম রাত তবু পোহাতে চায় না। অনেককে মৃত্যুবরণও করতে হয়। 'পৌষ গেল, মাঘ আইল শীতে কাঁপে বুক/ দুঃখীর না পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ।' গ্রাম বাংলার এ-প্রবাদটিই তুলে ধরে আমাদের দেশের অসহায় হতদরিদ্র মানুষদের শীতকালীন দৃশ্য। শীত পীড়িত হতদরিদ্র মানুষগুলো আমাদেরই ভাই। আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। আমাদেরই প্রতিবেশী। হাদিস শরিফে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তুমি ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতই দেখবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ যদি ব্যথা পায়, তবে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর কারণে জাগরণ ও জরের মাধ্যমে তার ব্যাথায় সহ-অংশীদার হয়।' (বুখারী ও মুসলিম) আসুন, আমরা তাদের কষ্টে আহত হই। তাদের দুঃখে ব্যথিত হই এবং এই দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়াই। সহযোগী হই। মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এছাড়া মানবেতর জীবন যাপন করা এসব দুস্থ, নিঃস্ব, ছিন্নমূল, গরিব-দুঃখী, বস্ত্রহীন মানুষদের সহযোগীতা করাটাই আমাদের কাছে তাদের পাওনা হক। যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন, 'অতএব আত্মীয়-স্বজন, গরিব-মিসকিন এবং অভাবী মুসাফিরকে তাদের হক আদায় করে দিবে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য এটাই শ্রেয় আর এরাই সফলকাম।' (সূরা রূম, ৩০:৩৮) উপরোক্ত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের পাশাপাশি দুর্বল, অভাবী, এতিম-মিসকিন, অসহায়-দরিদ্র ও ভিনদেশী মুসাফিরকেও সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হকদার সাব্যস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা কষ্টে নিপতিত এসব মানুষদের প্রতি অনুগ্রহ করতে আদেশ করেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো, যেমন আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছি।' (সূরা কাসাস, ২৯: ৭৭) হাদীস শরীফেও বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মানুষদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দয়া ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না।' (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বস্ত্রহীনদেরকে বস্ত্র দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করেছেন এবং তার বিনিময়ে আখিরাতে উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'তোমরা বস্ত্রহীন মানুষদের বস্ত্র দাও।' (বুখারী) 'যে মুসলমান অপর কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ বর্ণের পোশাক পড়াবেন।' (তিরমিজি ও আবু দাউদ) তীব্র শীতের প্রকোপে যে বিপুল জনগোষ্ঠী বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্টে দিন যাপন করবে, তাদের পাশে দাঁড়ানো ধর্মপ্রাণ মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তাই, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকা থেকে নতুন কিংবা পুরনো শীতবস্ত্র সংগ্রহ করে শীতার্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিই এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সহ অন্যান্যদেরকে তাদের পাশে দাঁড়াতে উৎসাহিত করি, এভাবে মিলেমিশে সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এই শীত কিছুটা হলেও তাদের জন্য সহনীয় হয়ে উঠবে।

মুসলিম হওয়ার গল্প-(৪)

মুহাম্মদ নূরন্নবী
শিক্ষক, আইডিয়াল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

পূর্ব প্রকাশের পর

আমার মা'কে দেখছি- আমার পিতার মৃত্যুর পর থেকে নিরামিষ আহার করে যাচ্ছেন। ডিম, মসুর ডাল, মাছ,মাংস ইত্যাদি উনার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ হয়ে গেছে। কারণ, উঁচু বংশে যাদের পতি(স্বামী) মারা যায়, তাদেরকে নিরামিষ আহার করতে হয়। এমনকি পুকুর ব্যবহার করার জন্য যে ঘাট(সিঁড়ি) ছিল, তাও নিরামিষ আহারীর জন্য আলাদা। আমার আরও অবাক লাগে- স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে নিরামিষ আহার করতে হয়। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামীর তা করতে হয় না। কী বৈষম্য! আমি চিন্তা করতে লাগলাম- সব মানুষ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। তারপরও সমাজে এত উঁচু নিচু ভেদাভেদ কেনো! জাতিভেদ প্রথা আমার পিতার বংশে প্রবল, তারা না কি ক্ষত্রিয়! অনেক উঁচু জাত! নিচু জাতের সাথে বিয়ে-শাদি করা যাবে না। এরূপ বিয়ে-শাদি করলে না কি 'বর্ণসংকর' তৈরী হয়। বর্ণসংকর তৈরী হলে সন্তান বিপথে যায়, আরো কতো কিছু ওরা বলে! একটু নিচু বংশে কারো বিয়ে হলে তাদের পুরো পরিবারকে সামাজিকভাবে এক ঘরে করে দিত। যা আমার মোটেই সহ্য হতো না। কী করব! তেরো চৌদ্দ বছর বয়সের একটা ছেলে অনগ্রসর ঘুণে ধরা সমাজের বিরুদ্ধে কী কথা বলবে! আপন মনে নানান রকম সুচিন্তা আসতে লাগল এবং ধীরে ধীরে পুরো সমাজের প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করল। আর আমি সব মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসতে শুরু করলাম। যখন আমি ৮ম শ্রেণিতে পড়তাম তখন নিম্ন বর্ণের বন্ধুরা যারা টাকার অভাবে টিচার রাখতে পারতো না, তাদেরকে গণিত শিখাতাম এবং আমি তাদের সাথে খেলাধূলা করতাম। তখন আমরা গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে প্রায় দেড় মাইল দূরের হাইস্কুলে যেতাম। সকল ধর্মের অনুসারীরা আমরা একসাথে স্কুল ছুটির পর বাড়িতে ফিরতাম। আমরা রাস্তার দুই পাশের মানুষের লাগানো সবজি ক্ষেত থেকে কাঁচা ঢেঁড়শ, বরবটি ও শশা ছিঁড়ে খেতাম। কিন্তু মুসলিম বন্ধুরা দেখতাম- এসব করতো না, তারা আমাদেরকে নিষেধ করত। মানুষের জিনিস না বলে নেয়া তো যাবে না। তাদের কথাগুলো আমার ভালো লাগল। আমি তাদের সাথে মিশতাম এবং আমি তাদের সাথেই খেলতাম। একদিন আমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলাম- আমার মুসলিম বন্ধুরা আমাকে বলল, এরূপ করা যাবে না।আমি তাদের পরামর্শে সে সময় থেকে প্রস্রাব বসে সারি এবং পানি ব্যবহার করি।

সেদিনের সে মনোরম বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে মা'কে খুশি মনে বললাম- আজ আমার মুসলিম সহপাঠীরা আমাকে দুইটি ভালো বিষয় শিখিয়েছেন, যা আমি ঐদিন থেকে মেনে চলব বলে জানালাম। মা আমার আগ্রহান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, কী এমন শিখেছি যে কারণে আমি আজ এতো খুশি। মা'কে শুধালাম-বন্ধুরা আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না সারতে এবং অন্যের জিনিস না বলে নিতে বারণ করেছে। মা আমায় জানালেন- অন্যের জিনিস না বলে নেয়া পাপ। কিন্তু প্রস্রাব যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করবে- এ ব্যাপারে আমাদের ধর্মেতো কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। আমি মা'কে বললাম- জীবনের সর্ববিষয়ে যেখানে পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা নেই, সেটা আবার কিরূপ ধর্ম। মা আমার কমেন্টের কোনো সদুত্তর দিতে পারে নাই। কিন্তু মা আমাকে সেদিন জীবন পরিবর্তনকারী আরেকটি বিষয় শিখিয়েছেন, যা আমি এখনো আমার জীবনে প্রয়োগ করে যাচ্ছি। মা আমাকে বললেন," তুমি এখন বড় হচ্ছ, ভালো ভালো বিষয়ের প্রতি তোমার আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সবসময় মনে রাখবে- মেয়ে হলো মায়ের জাত। মেয়েদেরকে মাতৃজ্ঞানে সম্মান করা উচিত। রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে কখনো মেয়েদের দিকে খারাপ নজরে তাকাবে না। ভুলক্রমে যদি তাকাতেই হয়, তাহলে পায়ের দিকে তাকাবে। দেখবে তোমার মায়ের পা এবং ঐ মেয়ের পায়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে।" সেই থেকে আমি রাস্তায় চলার সময় চোখ নিচু করে চলি। আমি মনে করি মায়ের সে শিক্ষাটাও মহান মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের নির্মল রশ্মির এক ঝলক।

যে কথা বলছিলাম- আমার মুসলিম সহপাঠীরা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ভালো এক শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি গ্রহণ করেছি। সে সময় আমার জীবনের ঘটনাপ্রবাহ বেশ গুরুত্ব বহন করে- আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের মাপকাঠি তাই নির্দেশ করে। তারা আমাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার দাওয়াত দিতেন, সময় সময়।

কবিতার ভাষায় আমি তা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি-

"হে মানুষ, তোমার অপরূপ রূপ, ভেবেছো কোথায় পেলে?
বৃথায় তোমার মিথ্যে বড়াই নানান অজুহাত তুলে।
তোমার হাতের অঙ্গুলিগুলো নিরেটতো হলো না,
নিরেট হলে অতি ভারে কিছু ধরা যেতো না।
তোমার হাতের নখগুলোতো বাড়িছে ক্রমাগত,
কিন্তু তোমার দাঁতগুলোতো রয়েছে সুসংগত।
চুলের বৃদ্ধি রয়েছে তোমার, দেহেরতো তা নেই।
খাচ্ছো,ঘুরছো, বকছো শুধু আসল কাজে নেই।
করিলো কে তোমায় সৃষ্টি? কে ঝড়ায় রহমতের বৃষ্টি?
কে ফলায় ফলফলাদি? উত্তর চাই! উত্তর চাই!
অন্তর তোমার এ কি বলে! অদেখা কিছু নেই।
অবিশ্বাস শুধু অদেখায়!
হায়রে অবুঝ!
তুমিতো তোমার পিঠ দেখো না, পারো না দেখিতে বায়ু।
না মানো যদি নাক চেপে দেখো, অদেখা বিনা পারো কী বাঁচিতে?
পারিবে না,পারিবে না। তবুও তুমি মানিবে না।
তুমিতো কোনো পশু নও,পশুর থেকে সৃষ্টিও নও।
মানুষ তুমি সুবিজ্ঞ ও ভাগ্যবান। আনো ভাই আল্লাহতে ঈমান।"

চলবে

নির্ভরযোগ্য **ইসলামিক** বইয়ের সুপরিচিত নাম

দারুল হিকমা লাইব্রেরী এণ্ড ষ্টেশনারী

এইচ.এম.আবু সুফিয়ান চৌধুরী
০১৮১৮ ০২৭১৬৮

স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসা সহ সব ধরনের বই এবং ষ্টেশনারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার

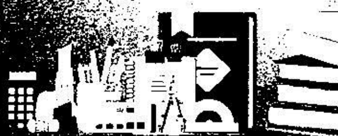

৯৬, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা)
উত্তর সিঁড়ি সংলগ্ন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৮ ০২৭১৬৮
ই-মেইল ঃ sufianabu138@gmail.com

মাসিক দা'ওয়াহ সাহিত্য পত্রিকার ৭ম সংখ্যার জন্য শুভেচ্ছা

আহমদ রশিদ বাহাদুর (ব্রাদার বাহার) সমাজকর্মী, লেখক ও ব্যবসায়ী

গাছের উপর চাপ কমান,
প্লাষ্টিকের দরজা লাগান

মেসার্স দরজা মেলা

সর্বপ্রকার প্লাষ্টিক দরজা, পিভিসি ফলস ডোর, সিজন করা কাঠের দরজা
কাঠের চৌকাট পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

২৩১/এ, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৯৭৬ ২১৬৬১৪, ০১৯১৯ ২১৬৬১৪
Facebook: /darzamela E-mail: brotherbahar7@gmail.com

ডিলার: আরএফএল পিভিসি ডোর, এন. মোহাম্মদ প্লাস্টিক ডোর, পারটেক্স পিভিসি ডোর, এনপলি পিভিসি ডোরসহ বিভিন্ন কোম্পানীর দরজা আপনার সাইজমত বিক্রয় করা হয়।

বিঃদ্রঃ- ভাঙ্গা প্লাস্টিক দরজা মেরামত করা হয়।

আরবী ভাষা শিক্ষার ধারাবাহিক আয়োজন (৪র্থ কিস্তি)

আরবী প্রবাদ ও বাগধারা (১ম পর্ব)

মীযান হারুন

শিক্ষার্থী (মাস্টার্স), কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব।

কয়েকদিন আগের কথা। কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি আরবী প্রোগ্রামে ছিলাম। প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে কথা হচ্ছিল। এগুলোর উৎস, ক্রমধারা, বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে। হঠাৎ স্যার উদাহরণ দিতে গিয়ে বললেন: (كن عصاميا ولا تكن عظاميا) এটার অর্থ কী? উপস্থিত সকলে যে যার মতো উত্তর দিতে লাগলো। এক পর্যায়ে স্যার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। এটা সম্পর্কে আমার পূর্ব-অবগতি ছিল না। ফলে আমি আনুমানিক একটা অর্থ দাঁড় করিয়ে বললাম, 'মানসিক বলে বলিয়ান হও, ভেঙে পড়ো না'। ভেবেছিলাম অর্থটা হবে। স্যার বললেন, না।

আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থিত কেউই প্রশ্নটির পূর্ণ উত্তর দিতে পারলো না। শেষে স্যার বললেন, (عصامي) শব্দের অর্থ যে নিজে কিছু করে, নিজের কর্মে প্রতিষ্ঠিত, অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। আর (عظامي) শব্দটি (عظام) তথা হাড় থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি হাড়ের ওপর নির্ভরশীল। হাড় বলতে এখানে অনেক আগে মরে যাওয়ার ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে, কবরে যাদের হাড় ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যাবে না। পুরো বাক্যটির মর্মার্থ হলো, নিজে কিছু করো। মৃত বাপ-দাদার গৌরবময় ইতিহাস বলা ও চর্চার মাঝে সীমাবদ্ধ থেকো না। এরপর স্যার বললেন, দুঃখজনকভাবে আজ গোটা মুসলিম উম্মাহ (عظامي) তথা হৃতগৌরবের ওপর নির্ভরশীল। হারুনুর রশীদ, সালাহউদ্দীন আইউবী, ইবনে খালদূন, ইবনে সীনার গৌরবগাঁথা বর্ণনায় ব্যস্ত। অথচ পুরো মুসলিম উম্মাহ তাদের মতো একজন এখন জন্ম দিতে অক্ষম।

যাইহোক, আমার প্রবন্ধ যেহেতু ইতিহাস বা সমকালীন বিষয়কে কেন্দ্র করে নয়: বরং আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে, তাই আমি সেদিকে আর যাবো না। উপরের উদাহরণটি শুধু এজন্য আনা যে, আরবী প্রবাদ-প্রবচন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন ও সুন্নাহতে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। প্রাচীন আরবী সাহিত্যের পাশাপাশি আধুনিক আরবীতেও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। উপরন্তু এমন অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার হচ্ছে আধুনিক আরবীতে, যা আগেকার আরবীতে পাওয়া যায় না, পাশাপাশি অনেকগুলো আবার বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত, ফলে সেগুলা জানা ও চর্চা করা আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রথমে কুরআনের প্রবাদ-প্রবচন প্রসঙ্গে আসা যাক। শুরুতেই যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটা হলো কুরআন হিদায়াতের গ্রন্থ, সাহিত্যের নয়। কিন্তু কুরআন যেহেতু সকল জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ কালাম, ফলে এটাতে আরবী প্রবাদ-প্রবচন- যা ভাষা ও সাহিত্যের অলংকারস্বরূপ- সেগুলোর অসংখ্য ব্যবহার চোখে পড়ে। আরবী বলা ও লেখালেখি সুন্দর করার জন্য এগুলো জানা ও ব্যবহার করা আবশ্যক।

উদাহরণ স্বরূপ কুরআনে ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ-প্রবচন/বিজ্ঞ-বচন তুলে ধরছি। বাংলাতে আমরা বলি যেমন কর্ম তেমন ফল। প্রচলিত আরবীতে একে বলা হয় (ما تزرع تحصد) কিংবা (كما تدين تدان)। কুরআনে একে বলা হয়েছে এভাবে: (من يعمل سوءا يجز به)। বাংলাতে আরেকটি প্রবাদ হলো: দেয়ালেরও কান আছে। প্রচলিত আরবীতে একে অনেকটা বাংলার মতোই বলা হয়: (للحيطان آذان)। কুরআনে এরকম কাছাকাছি একটি আয়াতাংশ হলো: (وفيكم سماعون لهم)। উপকারকারীর অপকার করা (احذر شر من أحسنت إليه) কুরআনের ভাষায় এটাকে বলা হয়:

(وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله)

আধুনিক আরবীতে প্রচলিত আরেকটি প্রবাদ হলো (الإنسان عدو ما جهله) বাংলায় এটার অর্থ দাঁড়ায় মানুষ যা জানে না সেটার বিরোধিতা করে। এটার প্রচলিত কোনো বাগধারা আমার জানা নেই। কুরআনে এটাকে এভাবে বলা হয়েছে:

بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم

এগুলো উপস্থিত মাথায় যা এলো সেগুলো উল্লেখ করলাম। বিস্তারিত জানার জন্য প্রাচীন লেখকদের মাঝে আব্দুল কাহের জুরজানীর আসরারুল বালাগা, আধুনিক লেখকদের মাঝে আব্দুর রহমান ময়দানীর 'আমসালুল কুরআন' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

আমি 'মিডিয়া আরবী কিভাবে শিখবো' গ্রন্থটিতে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে আধুনিক কিছু প্রবাদ/বাগধারা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠকগণ বিস্তারিত জানার জন্য সেটা দেখতে পারেন। এখানে উদাহরণ হিসেবে কিছু আরবী বাগধারা উল্লেখ করছি:

এক. বাংলাতে আমরা বলি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আরবীতে শব্দটা সাধারণত আকর্ণ বা কান পর্যন্ত বলা হয়। যেমন: العَالَمُ غَارِقٌ حتى أُذُنَيْهِ في السلاح। আরবীতে পুরো পৃথিবী আকণ্ঠ অস্ত্র আর হাতিয়ারে নিমজ্জিত।

দুই. বাংলাতে আমরা বলি বালুতে মাথা গোঁজা। এর অর্থ পাত্তা না দেয়া, এড়িয়ে যাওয়া, দেখেও না দেখা। আরবীতে এটা শাব্দিক অর্থেই এভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়:

ولسنا في حاجةٍ أن نَدْفنَ رؤوسَنا في الرِّمَال

শাব্দিক অর্থাৎ বালুতে মাথা গুঁজে রাখার দরকার নেই।

তিন. বাংলাতে আমরা বলি চায়ের কাপে ঝড় তোলা। অর্থাৎ কোনো বিষয় নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হওয়া। এখন যেটা বলা হয় ভাইরাল। আরবীতে শব্দটা শাব্দিক অর্থেই এভাবে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়: أثارَ زَوْبَعَةً في فِنْجَانٍ

চার. বাংলাতে আমরা বলি পোড়-খাওয়া লোক। অর্থাৎ যিনি জ্বলে-পুড়ে, বিভিন্ন দুঃসময় ও সংকট পাড়ি দিয়ে এসেছেন। এক কথায় ঝানু ও অভিজ্ঞ লোক। আরবীতে এটাও অনেকটা শাব্দিক অর্থেই এভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়: احْتَرَقَتْ أصابِعُه। অর্থ পোড়-খাওয়া লোক।

পাঁচ. বাংলাতে আমরা বলি লালায়িত হওয়া। কোনো জিনিসের জন্য করা বা জিভে জল আসা। আরবিতেও এটা হুবহু শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বলা হয়: سال لعابه অর্থাৎ লালায়িত হলো।

আগামী পর্বে এসম্পর্কে আরও কিছু তুলনামূলক আলোচনার ইচ্ছা রাখি। আল্লাহ তাওফীকদাতা

মাসিক
দা'ওয়াহ

পড়ুন, লিখুন
বিজ্ঞাপন দিন

মাসিক দা'ওয়াহ পত্রিকায় লেখা দেয়ার নিয়মাবলী:

১. ইসলামী প্রবন্ধ, ছোট গল্প, সমসাময়িক বিষয়, শিক্ষনীয় যেকোনো অভিজ্ঞতা, কবিতা ইত্যাদি লেখা কম্পিউটার/মোবাইল-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।
২. লেখা হতে হবে সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায়। ১৫০০ শব্দের বেশী নয়।
৩. বাংলা ও আরবীতে লেখা যাবে।
৪. লেখা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
৫. লেখার সাথে লেখকের যথাযথ নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং, ছবি (যদি পারা যায়) ইত্যাদি সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে।
৬. লেখা প্রকাশিত হলে লেখককে তা জানানো হবে এবং ধারাবাহিকভাবে তিন মাসের মাসিক দা'ওয়াহ পত্রিকা তার ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে।
৭. লেখা পাঠানোর ঠিকানা: monthlydawah@gmail.com
৮. লেখা হোয়াটসআপেও পাঠাতে পারবেন: ০১৬৭৩৯০৯২০৫

উত্তর প্রদানে

মোঃ শাহ জালাল

সহকারী অধ্যাপক, দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

প্রশ্ন: হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক কী? এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়ার বিধান জানতে চাই।

উত্তর: হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক হল মাতৃদুগ্ধ সংরক্ষণাগার। যেসব মায়েদের নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে কিংবা সন্তানকে খাওয়ানোর পরও যাদের স্তনে অতিরিক্ত দুধ থাকে, তাদের দুধ আহরণ করে যে সংস্থা বা সংরক্ষণাগার কৃত্রিমভাবে তা সংরক্ষণ করে তা হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বা মাতৃদুগ্ধ সংরক্ষণাগার নামে পরিচিত। এই সংরক্ষণাগারের উদ্দেশ্য হল যেসব শিশুরা নিজ মায়ের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত তারা যেন অন্য মায়ের দুধ পানের সুযোগ পায়।

মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও ইউনিসেফ যে কোনো নবজাতককে জন্মের পর থেকে অন্তত ছয়মাস মাতৃদুগ্ধ পান করানোর পরামর্শ দিয়েছে। এই পরামর্শের আলোকে বিংশ শতাব্দির সত্তরের দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কি অবৈধ তা জানার জন্য নিম্নের কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

১. প্রত্যেক মায়ের দুধ পবিত্র ও হালাল। তিনি যেমন নিজের সন্তানকে দুধ পান করাতে পারেন, তেমনিভাবে অন্যের সন্তানকেও দুধ পান করাতে পারেন। এমনকি সরাসরি স্তন্যদানের পরিবর্তে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় দুধ বের করে শিশুকে খাওয়ানোও সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। রাসুল (সা.) নিজেও অন্য মায়ের দুধ পান করেছেন।

২. দুই বছর বয়সের মধ্যে শিশু সরাসরি যে মায়ের দুধ পান করবে, তার সাথে জন্মদাত্রী মায়ের মত সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তাই জন্মদাত্রী মা ও তার যে সকল আত্মীয় বিয়ে করা নিষিদ্ধ দুধ মা ও তার ঐ সকল আত্মীয়কেও বিয়ে করা নিষিদ্ধ। রাসুল (স.) ইরশাদ করেন: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

'বংশের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ, স্তন্যদানের কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ' (সহীহ আল-বুখারী হাদিস নং ২৫০২)।

৩. কিন্তু যদি কোন মহিলার দুধ স্তন থেকে বের করে অন্য মাধ্যমে শিশুকে পান করানো হয়, তাহলে তাকে দুধ মা হিসাবে গণ্য করা হবে কি না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

ক. ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমদসহ অধিকাংশ ইমামদের মতে, শিশু কীভাবে দুধ পান করেছে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং শিশুর পাকস্থলিতে দুধ পৌঁছেছে কি না তাই বিবেচ্য বিষয়। অতএব শিশু যদি সরাসরি কোন মহিলার দুধ পান না করে অন্য কোন মাধ্যমে তা তার পাকস্থলিতে পৌঁছে, তাহলে ঐ মহিলাকেও তার দুধ মা হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রয়োগ করা হবে। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

১. উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) ইরশাদ করেছেন: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

'স্তন্যদান কিছুই হারাম করবে না- যদি না তা পাকস্থলিতে পৌঁছে' (সুনান আল-তিরমিজি, হাদিস নং ১০৭২)।

২. সালিম (রা.) আবু হুজাইফা (রা.) এর পালকপুত্র ছিলেন। তিনি যখন বড় হলেন, তখন আবু হুজাইফা (রা.) এর স্ত্রী সাহলা বিনতু সুহাইল (রা.) রাসুল (স.) এর কাছে এসে বললেন:

إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ

'সালিম তো বয়সপ্রাপ্ত হয়েছে। বড়রা যা বুঝে সেও তা বুঝে। সে আমাদের কাছে আসে। আমার ধারণা যে, আবু হুজাইফা বিষয়টা পছন্দ করে না। তখন রাসুল (স.) তাকে বললেন: 'তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। তাহলে তুমি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং আবু হুজাইফার মনের সন্দেহও দূর হয়ে যাবে' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৩৭)। ইবনু সা'দ যুহরী থেকে বর্ণনা করেন:

كانت تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم

'তিনি (সাহলা) দুধ বের করে একটি পাত্রে রাখতেন, আর সালিম তা পান করত' (আল-তাবাকাত আল-কুবরা ৮ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, সরাসরি স্তন থেকে দুধ পান করা শর্ত নয়। অন্য কোন মাধ্যমে পান করলেও দুধ মায়ের বিধান কার্যকর হবে।

খ. অপর পক্ষে আতা' বিন রাবাহ, লাইস বিন সা'দ, ইবনু হাজম, দাউদ আল-জাহিরী ও ইমাম আহমদের অন্য আরেকটি মতে সরাসরি স্তন থেকে দুধ পান করা শর্ত। অন্য কোন মাধ্যমে পান করলে দুধ মায়ের বিধান কার্যকর হবে না। তাদের প্রমাণ নিম্নরূপ।

১. পবিত্র কুরআন ও হাদিসে 'রাদাআত' (رضاعة) বা স্তন্যদানের কথা বলা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের স্তন্যদানকারী মায়েদেরকে এবং তোমাদের দুধ বোনদেরকে' (সুরা আল-নিসা আয়াত নং ২৩)। অনুরূপভাবে হাদিসেও বলা হয়েছে:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

'বংশের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ, স্তন্যদানের কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ' (সহীহ আল-বুখারী, হাদিস নং ২৫০২)। আর 'রাদাআত' (رضاعة) বা স্তন্যদান মানে স্তন চুষে দুধ পান করা। অন্য কোন মাধ্যমে বুকের দুধ মুখে পান করাকে আরবিতে 'ওয়াজুর' (وجور) এবং নাক দিয়ে খাওয়ানোকে 'সাউত' (سعوط) বলা হয়- যা কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি। তাই এর মাধ্যমে দুধ মায়ের হুকুম কার্যকর হবে না। এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজম বলেন:

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، فَإِنَّمَا هُوَ: مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ بِفِيهِ فَقَطْ. فَأَمَّا مَنْ سُقِيَ لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إِنَاءٍ، أَوْ حُلِبَ فِي فِيهِ فَبَلَعَهُ، أَوْ أُطْعِمَهُ بِخُبْزٍ، أَوْ فِي طَعَامٍ، أَوْ صُبَّ فِي فَمِهِ، أَوْ فِي أَنْفِهِ، أَوْ فِي أُذُنِهِ، أَوْ حُقِنَ بِهِ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا

'যে স্তন্যদানের কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, তা শিশু দুধ মায়ের স্তন থেকে মুখ দিয়ে চুষে পান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি কারো দুধ পাত্র থেকে পান করানো হয়, কিংবা স্তন থেকে মুখে দোহন করা হয়, কিংবা কোন রুটি বা খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়, কিংবা মুখে ঢেলে দেওয়া হয়, কিংবা নাক বা কান দিয়ে খাওয়ানো হয়, কিংবা ইনজেকশানের মাধ্যমে খাদ্যনালীতে পৌঁছানো হয়, তাহলে এর মাধ্যমে বিবাহ নিষিদ্ধ হবে না' (আল-মুহালা, ১০ম খন্ড, ৭ম পৃষ্ঠা)।

২. উম্মু ফদল থেকে বর্ণিত। রাসুল (স.) ইরশাদ করেছেন:

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ

'একবার বা দুই বার স্তন চুষে দুধ পান করাতে বিবাহ নিষিদ্ধ হবে না (তিন বা তিনের অধিক হতে হবে) সুনান আল-বাইহাকি হাদিস নং ১৬০৪৩। এ হাদিস থেকে প্রমানিত হয় যে, স্তন্যদানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে স্তন মুখে নিয়ে দুধ পান করা। অতএব অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় বিবাহ নিষিদ্ধ হবে না।

মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং তা থেকে শিশুদেরকে দুধ পান করানোর বিষয়টি উপরোক্ত মাসয়ালার ওপর নির্ভরশীল। কারণ মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক থেকে সরবরাহকৃত দুধ সরাসরি মায়ের স্তন থেকে পান করানো সম্ভব নয়। বরং অন্য কোনো উপায়ে তা শিশুকে পান করাতে হয়। তাই অধিকাংশ আলেম ও মুসলিম স্কলারদের মতে মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক থেকে সরবরাহকৃত দুধ পান করানোর মাধ্যমে দুধ মায়ের বিধান কার্যকর হবে। যেহতু এ ক্ষেত্রে দুধ মা তার দুধ কাকে পান করানো হচ্ছে, তা জানেন না এবং শিশু ও তার অভিভাব-করাও দুধ মাকে চিনেন না, তাই ভবিষ্যতে দুধ ভাই-বোন ও নিষিদ্ধ আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে-যা শরিয়তে জঘন্যতম ব্যাভিচার হিসাবে গণ্য। এ ছাড়া এ ধরনের প্রক্রিয়া মায়ের দুধ ক্রয় বিক্রয়ে উৎসহিত করবে, মায়েদের মানবিক মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করবে এবং তাদেরকে গরু ছাগলের মত ব্যবহার করবে। তাই মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং তা থেকে শিশুদেরকে দুধ পান করানো উভয়টি হারাম। বর্তমান যুগের আলেমদের মধ্যে শাইখ ওসাইমিন, মুফতি তাকী ওসমানী ও OIC এর অধীনস্থ ইসলামী ফিক্হ বোর্ড এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

অপর দিকে অন্য আরেক দল মুসলিম স্কলারদের মতে মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক থেকে সরবরাহকৃত দুধ পান করানোর মাধ্যমে দুধ মায়ের বিধান কার্যকর হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে শিশু মায়ের স্তন চুষে দুধ পান করেনি। তাই নিষিদ্ধ বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। এ ছাড়া দুধ মা অজ্ঞাত থাকলে কিংবা তার সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও অধিকাংশ আলেমদের নিকট দুধ মায়ের বিধান কার্যকর হয় না। তাই মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক থেকে সরবরাহকৃত দুধে দুধ মা অজ্ঞাত থাকলে দুধ মায়ের বিধান কার্যকর হবে না। অতএব তাদের মতে মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং তা থেকে শিশুদেরকে দুধ পান করানো উভয়টি বৈধ। বর্তমান যুগের আলেমদের মধ্যে মুস্তাফা আল-জারকা, ড. ইউসুফ আল-কারদাবী ও মিশরীয় ফাতওয়া বোর্ড এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

আমাদের বিবেচনায় শিশুর জন্য যেমন মাতৃদুগ্ধ প্রয়োজন, তেমনি তার বিকাশ ও মননশীলতার জন্য মাতৃস্নেহ ও ভালোবাসার কোন বিকল্প নেই। তাই মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক অপেক্ষা শরিয়ত স্বীকৃত স্তন্যদাত্রী দুধ মায়ের পদ্ধটি বেশী যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত। তবে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে শিশুদেরকে দুধ পান করাতে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

১. প্রত্যেক মায়ের দুধ আলাদা করে সংরক্ষণ করা এবং তাদের বিস্তারিত পরিচয় (বংশীয় আত্মীয় সহকারে) লিপিবদ্ধ করে রাখা।

২. যে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ব্যাংক থেকে দুধ সরবরাহ করা হবে তার বিস্তারিত পরিচয় লিখে রাখা এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে পরস্পরের বিস্তারিত পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করা।

৩. মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ ও বিতরণে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন না করে শুধুমাত্র মানবিক দিক বিবেচনা তা সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

কে আমায় ডাকে

হাদিকাতুল কুবরা
দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, বিভাগ, আইআইইউসি

জানি না শুধু এক দীর্ঘশ্বাস,
গভীর এক ক্ষত ভেতরে;
পুঞ্জিভূত নেই তো কিছু, কি নিয়ে যাব পরপারে?
স্বপ্নীল গগণটা কেন জানি ভরে গেছে তিমিরে,
ক'দিন ধরে অনুভূতি যেন জমাব পাড়ি কবরে ।
সুবিশাল আকাশটা যেন হয়ে গেছে খুব সংকুচিত,
বিশাল এই ধরাটাও যেন হয়ে গেছে খুবই ছোট।
মনে হচ্ছে এই ক্ষদ্র পরিধিতে,
আমাকে দিবে না আর কেউ ঠাঁই,
কেন এই বুক ভরিয়েছি তবে এত মমতায়?
মনে হচ্ছে কোথাও নেই যেন একটু আলো,
কেন তবে এত বেসেছি ভালো?
কেন তবে গড়েছি এত মায়া?
কেন তবে পেয়েছি এত আপন ছায়া?
কেন তবে মমতা জলদি করেছি মনে এ ধরাকে?
যাব তো চলে হঠাৎ,সব মমতা ফেলে রেখে।
ভেসেছি ভালো তবে অনেক বেশি,
যার পরশে এখনো আমি বেঁচে আছি।
যেতে হবে চলে, তার সান্নিধ্যে;
এ কথা শুধু বারবার পড়ছে মনে।
মায়ার এ জাল যে শুধু পিছু টানে,
মা, বাবা, ভাই, বোন;
কত মমতাময়ী এ বাঁধন।
বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন,
বসুধায় ছিল যে কত আপন।
এসব ভাবতে ভাবতে,
জানি না কখন পড়েছি ঘুমিয়ে,
কিন্তু...
আমি এখন এসেছি সেখানে,
কেউ নেই আপনজন যেখানে
অন্ধ, পথহারা এক পথিক যেন আমি;
ঘোর তমসায় চারিদিক ভরা,
সংকুচিত কী এক আলয়;
চিৎকার করে বলছি কোথায় তোমরা?
শুনতে কি পাও না কেউ আমার আর্তনাদ?
কোথায় তোমরা?
আমায় ফেলে কোথায় গেছো আজ?
হঠাৎ দুই আগন্তুক,
যাদের দেখিনি কখনো মায়াবী ধরাতে;
কেন তারা আমায় তবে এত প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছে?
প্রশ্ন শুনে তো আমি হতভম্ব, বিচলিত;
আমাকে এখন কেউ সাহায্য করছে না তো,
হঠাৎ গভীর ঘুমে মগ্ন থাকা আমি,
গভীর রাতে স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠি।
তামাম বসুধা এখন ঘুমের গভীরে,
আমি কেবল খুঁজছি তাঁরে;
যিনি পাঠিয়েছেন আমাকে,
আবার ডাকছেন তার কাছে।
অজানা এক ব্যথায় ভরে গেছে মনটা,
শান্তিতে ভরিয়ে দিতে চাই হৃদয়ের কোণটা।
তাই সিজদায় লুটিয়েছি নিজেকে,
সঁপে দিয়েছি তাঁর কাছে আমার আমিকে।
প্রশান্তি ভরে তাঁর কাছে করেছি কামনা,
রাব্বি! জান্নাত যেন হয় ওগো স্থায়ী ঠিকানা।
এ ধরাতে তাদেরে ভালবাসি,
যাদের ভালোবাসা তোমার সন্তুষ্টি।
তাই ওগো মালিক সবার!
জান্নাতেও রাখিও তুমি একসাথে আবার।
আমাদের ভালোবাসা যেন না হয় শুধু এ ধরাতে,
মমতার পরশে রাখিও জড়িয়ে আখিরাতে।

প্রিয় বই!

আকিলা ইবনাত
আলিম ২য় বর্ষ, আইডিয়াল গার্লস মাদরাসা চট্টগ্রাম।

প্রিয় বই, তুমি আমার নিত্য দিনের সাথী
তুমিই আমার জ্ঞান রাজ্যের অনন্য এক বাতি।
জ্ঞান পিপাসায় কাতর হলে হন্য হয়ে তোমায় খুঁজি
তোমার মাঝে ডুবে গিয়ে অজানা অনেক বিষয় বুঝি।
তুমি ছাড়া কেমন জানি, একলা বড় লাগে
তাইতো তোমায় পাশে রাখি, আমি সবার আগে।
একলা যখন বসে থাকি সঙ্গে রাখি তোমায়
তোমার মাঝে থেকে আমি সুদূর হারিয়ে যাই!

ধন্য দাওয়াহ

মোহাম্মদ উজাইর কুতুবী
আরবি প্রভাষক, আইডিয়াল মাদরাসা চট্টগ্রাম।

সাম্প্রতিক মোদের দেশকে খেয়ে ফেলেছে অনৈসলামিক আনুষাঙ্গিক,
ধন্য দাওয়াহ আত্মপ্রকাশ ঠিক সময়ে চাহিদা মাফিক।
দেশ নাগরিক তোমায় জানায় অভিনন্দন আন্তরিক,
বিনে শংকায় এগিয়ে চলো আমরা তোমার আনুপাদিক।
তুমি দূরন্ত কলম যোদ্ধা নির্ভীক সাহসী সৈনিক
তুমি স্বচ্ছ দ্বীন প্রচারে স্বাচ্ছা তথ্যের নাবিক।
তুমি উড়ন্ত অভিযাত্রী দীপ্ত মশাল আলোর প্রতীক,
তোমার প্রভায় জ্বলে পুড়ে মরবে বেঈমান মুশরিক।
তোমার পঠনে পাঠক মহলে মিলবে প্রেরণা সার্বিক,
ক্ষণে ক্ষণে পাবে উত্তরমালা যত প্রশ্ন সাংশায়িক।
তোমার দাওয়াতে রবে না লোকে বুকে সংঘাত আদর্শিক,
মতানৈক্য-বিদ্বেষ ভুলে সব হবে এক পথিক।
প্রভুর দোরে তোমার জন্য খুঁজি সদা তাওফীক,
তোমার মিশন ছড়ায় যেন দেশ-বিদেশ চৌদিক।

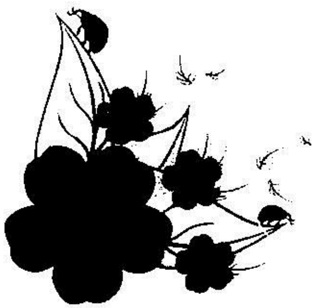

আমি স্বপ্ন দেখি

আমান উল্লাহ
ছাত্র, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আইআইইউসি

আমি স্বপ্ন দেখি আলোকিত হবে, জ্বলবে বাতি ঐ কালো আঁধারে ভরা মানসিকতার বিবেকে।
আমি স্বপ্ন দেখি সুস্থ হবে, মানবাধিকার কর্মী মানবতার ফেরিওয়ালাদের অসুস্থ মস্তিষ্ক গুলি।
আমি স্বপ্ন দেখি ঐক্য হবে, ধর্মীয় মতাদর্শ ভুলে মুহাম্মদের রেখে যাওয়া এক আদর্শে শির উঁচু করে ।
আমি স্বপ্ন দেখি সাম্যের জয়গানে দল মত নির্বিশেষে সবাই মানুষ হবে, বাঁচবে সম অধিকারে।
আমি স্বপ্ন দেখি রাজনৈতিক নেতা সমাজ সেবক হয়ে জন্মাবে, অন্যকে হতে হবে না তার বলি ।
আমি স্বপ্ন দেখি মানুষের মাঝে আসবে ফিরে, শান্তি ভ্রাতৃত্ব স্নেহ ও ভালোবাসার পরশে বন্ধন।
আমি স্বপ্ন দেখি রঙ্গিন সূর্য উঠবে ভোরে আযানের ধ্বনিতে মাতোয়ারা হয়ে ঘুরবে পৃথিবীর বুকে।

মা তোমায় পেয়ে!

রাকিবুল হোসাইন মুকিত
শিক্ষার্থী, আইডিয়াল বয়েজ মাদরাসা চট্টগ্রাম।

একলা ঘরে বসে আমি কাঁদি যখন মা
তোমার মতো কেউ তখন আদর করে না।
আমি কোনো কষ্ট পেলে তোমার কষ্ট লাগে
তুমি ছাড়া আমার কষ্টে আসে না কেউ আগে।
তুমি ছাড়া মা এই দুনিয়া অরণ্যের মতো
পৃথিবীতে নাই কেহ মা তোমারি মতো।
আমি যখন একটু হাসি খুশি হওগো তুমি
তোমার এ খুশির ছোয়ায় সুখী হলাম আমি।
মা আমার আপন, মা আমার মণি
মা তোমায় কাছে পেলে, পাই সুখের খনি।
মা তুমি অনেক দামী সোনা রূপার চেয়ে
এই দুনিয়ায় ধন্য হলাম, মা তোমায় পেয়ে।

মাসিক দাওয়াহ

আব্দুল্লাহ ইয়াছিন
ছাত্র, আলিম ১ম বর্ষ, সীতাকুণ্ড কামিল মাদ্রাসা

মা- য়া মাখা বুলি কতই না শুনি,
সি- য়াচ্ছান্ন জীবনে কতটা মানি।
ক- রি প্রার্থনা চলিতে মুস্তাকিম সিরাতে,
দা- ওয়াহ মাসিক সে আলোক প্রভা এ পথে।
ও- গো ভাই হে ঐশী আলোর আঙ্গিনা,
য়া- সির পথের পথিক তবে দ্বীন তো বুঝি না।
হ- ক্বের সাথে থাকতে তুমি অনন্য এক জুড়ি,
দ্বীনের পথে চলতে মোরা তোমারি স্নিগ্ধকুড়ি।

হে আমার মালিক!

আবু বকর ছিদ্দীক
সাবেক শিক্ষার্থী, কুরআনিক সাইন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আইআইইউসি।

আমি মাঝে মাঝে প্রকৃতির হাসি আনন্দে হারিয়ে যাই,
কি অপূর্ব নয়নাভিরাম সৃজন আমার মালিকের!
দূর সীমানায় আসমান আর প্রকৃতি যেন জমজ ভাই!
মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি সারি সারি সাজানো
আমার রবের সৃষ্টির দিকে
সহস্র আবেগে সেজদায় লুটিয়ে পড়ি তখনি!
হে আমার মালিক!
জানিনা তুমি কত সুন্দর! কত অপূর্ব!
তোমার প্রেমে যারা লুটিয়ে পড়েছে তাদের থেকে
আমায় বিচ্ছিন্ন করোনা।
তোমার প্রেমে মুগ্ধ করে রাখো আমার প্রতিটি লগ্ন!
হে আমার মালিক!
আমায় ছুড়ে ফেলোনা আগাছার ন্যায়,
তাদের পথে রেখো যারা সবটুকু দিয়েছে তোমায়!

মায়ের স্মরণ

মুস্তাকীম বিল্লাহ

মায়ের বোনা নকসিকাঁথা সুতোয় সুতোয় গড়া
ফুল পাতা আর লতার ছবি পুরো কাঁথা ভরা
দেহে যখন জড়াই
শৈলি দেখে মাকে নিয়ে করি তখন বড়াই।
মসলাবাটা কলসি ভরা সকল খাবার রাঁধা
নিত্য একাই করে যেতেন মায়ার সুতোয় বাঁধা
গরম পাতিল কড়াই
মাটির চুলোয় রান্না ছিলো ধোঁয়ার সাথে লড়াই।
ঘরের সকল ময়লা কাপড় একাই ধুতেন হাতে
শৌচাগারে নিয়ে যেতেন পড়লে প্রয়োজন রাতে।
কত রকম পিঠাই
স্বাদের খাবার পেট পুরে আজ কেমন করে মিটাই!

শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞানার্জন, জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য মুক্তি

দারুল হিকমা মাদরাসা চট্টগ্রাম
দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়

DHMC

ভর্তি চলছে

হিফজ বিভাগ • নাজেরা বিভাগ
নুরানি বিভাগ • শর্টকোর্স
প্লে থেকে ৯ম শ্রেণি
আবাসিক • অনাবাসিক • সারাদিন

আমাদের বৈশিষ্ট্য

জীবনের লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য- নীতিবান ও জ্ঞানী করে তোলা।
জীবনের লক্ষ্য- শিক্ষার লক্ষ্যের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে তৈরি করা। ইসলামি জ্ঞান ছাড়া এই [জীবন] লক্ষ্য সাধন সম্ভব নয়। সন্তানকে জীবনের নির্দিষ্ট সময় অন্তত নিম্নমাধ্যমিক পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা এর অনুশীলনে রত রাখুন। সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা তো থাকছেই।
একদিকে সন্তান নৈতিক [ধার্মিক], আদর্শবান নাগরিক, সৎ মানুষ ও পরকালে নাজাতের উসিলা [মাধ্যম] হবে। অপরদিকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে আলেম, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার... হয়ে মানবসেবা ও জীবিকার্জনের সুযোগ পাবে।
তাই সন্তানকে পেশাদার বানানোর আগে তাকওয়া শিক্ষা দিন। সে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে সফলতা অর্জন করতে পারবে।

একাডেমিক সুবিধা:

- সহজ ও সুপরিকল্পিত পাঠদান।
- ইংরেজি ও আরবি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।
- সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক ক্লাস [ড্রইং, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ, ইসলামি সংগীত, কবিতা আবৃত্তি]
- নিরিবিলি ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা।
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা পাঠদান।
- সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

ডিজিটাল সুবিধা:

- সি.সি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস।
- এস.এম.এস এলার্ট [অভিভাবকের প্রতি শিক্ষার্থীর আগমন-প্রস্থানের অবগতিমূলক ক্ষুদে বার্তা]
- অনলাইনভিত্তিক ভর্তিসহ যাবতীয় কার্যক্রম।
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরোম [পরিকল্পনাধীন]

সৈয়দ শাহ রোড, (হাসপাতাল সংলগ্ন) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
01819-009994
01836-924711
Darul Hikma Madrasah Chattogram
darulhikmactg@gmail.com

আইআইইউসিতে বিজয় দিবস উদযাপিত

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি)'তে উদযাপিত হল মহান বিজয় দিবস। ১৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৬টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কে. এম গোলাম মহিউদ্দিনসহ উর্ধতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, শিক্ষক, শিক্ষার্থীগণ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে বিজয় র‍্যালি বের করেন।

র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শেষ হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক কে. এম গোলাম মহিউদ্দীন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ আলী আজাদী, রেজিস্টার কর্ণেল আবুল কাশেম, সহকারী রেজিস্টার মো. সোলায়মান মিয়া, সহকারী প্রক্টর মো. নিজাম উদ্দীনসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দা'ওয়াহ শিক্ষার্থীদের মাঝে মেরিট অ্যাওয়ার্ড বিতরণ

দাওয়াহ বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেরিট অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করা হয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর সৌদি আরব থেকে আগত মেহমানদের হাত থেকে তারা এই অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা স্প্রিং সেমিস্টার-২০১৯ এ জিপিএ-৩.৯০ থেকে জিপিএ- ৪.০০ অর্জন করেছে তাদেরকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

দাওয়াহ বিভাগের উদ্যোগে আইআইইউসিতে অ্যাকাডেমিক সেমিনার

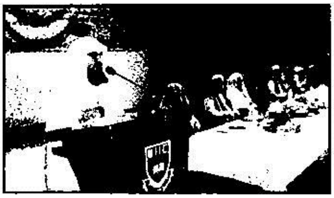

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি)'র দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে অ্যাকাডেমিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে "দাওয়াতী কাজে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার" এবং "ফিক্বহী মতবিরোধ ও দাওয়াতী ময়দানে এর প্রভাব" শীর্ষক এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবের কুলিয়াতুল হারাম ও আল বাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মিশাল বিন হুমাইদ আল লুহাইবী এবং মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমান জামীল কাসসাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের CENURC'র অধ্যাপক ড. বি. এম মফিজুর রহমান আল আযহারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দা'ওয়াহ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শরীয়া'হ অনুষদের ডীন ড. মুহাম্মাদ শাফী উদ্দীন মাদানী।

"দাওয়াতী কাজে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার" বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমান জামীল কাসসাস।

"ফিক্বহী মতবিরোধ ও দাওয়াতী ময়দানে এর প্রভাব" বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সৌদি আরবের কুলিয়াতুল হারাম ও আল বাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মিশাল বিন হুমাইদ আল লুহাইবী বলেন, ফিকহী ইখতেলাফ যেন ইফতেরাকের কারণ না হয়। সালাফের মধ্যে অনেক বিষয়ে ইখতেলাফ ছিল কিন্তু তারা এ নিয়ে দলে দলে বিভক্ত হননি।

রেলমন্ত্রীর সাথে আইআইইউসি ভিসি'র সৌজন্য সাক্ষাৎ

রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজনের সাথে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি) এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কে. এম গোলাম মহিউদ্দিন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় আইআইইউসি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বোর্ড অব ট্রাস্টীজ এর সদস্য মুহাম্মদ নূরুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২ ডিসেম্বর রোববার ঢাকায় রেলমন্ত্রীর দাপ্তরিক কার্যালয়ে এই সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজনকে আইআইইউসি'র পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

দা'ওয়াহ কুইজ কনটেস্ট ডিসেম্বর ২০১৯ এর সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

১. কাজী সুমাইয়া এহসান
২. মুহাম্মদ আলী মুর্তাজা
৩. হালিমাতুস সাদিয়া আকিদা
৪. আকরাম হোসেন
৫. মো: জহির উদ্দিন
৬. মাসরুর উল আলম
৭. মাহদিয়া জাইমা

মাসিক দা'ওয়াহ
পড়ুন
লিখুন
বিজ্ঞাপন দিন
প্রিয়জনকে উপহার দিন

দা'ওয়াহ কুইজ কনটেস্ট

কুইজে অংশগ্রহণের নিয়মাবলী

১. যে কেউ এই কুইজ কনটেস্টে অংশ নিতে পারবেন।
২. কুইজের উত্তর ইমেইল অথবা ডাক যোগে পাঠানো যাবে।
৩. কুইজের উত্তর প্রতি ইংরেজী মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে পৌছাতে হবে।
৪. কুইজের প্রশ্ন মাসিক দা'ওয়াহ এর সংশ্লিষ্ট সংখ্যার বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে করা হবে।
৫. প্রথম স্থান অধিকারীকে এক বছরের জন্য ফ্রি মাসিক দাওয়াহ পত্রিকা প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে যথাক্রমে ছয় মাস ও তিন মাসের ফ্রি পত্রিকা দেয়া হবে।
৬. প্রশ্নোত্তরের সাথে অবশ্যই বিস্তারিত নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

গত সংখ্যার উত্তর

১. আলেকজান্ডার।
২. ঘড়ির কাঁটার বিপরীত।
৩. সফল।
৪. যুবক জাকারিয়া (জ্যাক)।
৫. হযরত আনাস বিন মালেক (র.) এর।
৬. 'এক পেয়ার কা নাগমা হায়' নিবন্ধের লেখক ড. আব্দুস সালাম আজাদীর।
৭. লুটতরাজ।
৮. উত্তম রচিত্র।
৯. বড় পুরোধা।
১০. ৮২ জন।

লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছেন-

১. মাহদিয়া জাইমা, তৃতীয় শ্রেণী, হালি শহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।
২. হালিমাতুস সাদিয়া আকিদা, ১০ম শ্রেণী, আল হুমায়রা মহিলা মাদরাসা।
৩. আকরাম হোসেন রুমান, আলিম ১ম বর্ষ, সীতাকুন্ড কামিল মাদরাসা।

এ সংখ্যার প্রশ্নাবলী

১. হযরত আলী (রা.) কোন ধরনের তওবাকে মিথ্যাবাদী তওবা আখ্যা দিয়েছেন?
উত্তর ঃ

২. তাকওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিদান কী?
উত্তর ঃ

৩. দুই দরিয়া কী?
উত্তর ঃ

৪. লোহিত সাগর কোন শিল্পের জন্য বিখ্যাত?
উত্তর ঃ

৫. 'কুরআনকে বুঝুন কুরআনের মত করে' এ কথাটি কার?
উত্তর ঃ

৬. বাগদাদের কাগজকে কী বলা হতো?
উত্তর ঃ

৭. আমানি কাকে বলে?
উত্তর ঃ

৮. বাংলাদেশে আড়াই বছর চাকুরী করার পর বুঝলাম, এই দেশটা থেকে........................অনেক কমে যাচ্ছে।

৯. 'প্রতিটি মানুষ হলো একটি ছোট্ট পৃথিবী' এই কথাটি কে উল্লেখ করেছেন?
উত্তর ঃ

১০. মানুষের আড্ডায় কীসের সারাংশ থাকে?
উত্তর ঃ

নাম:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

শ্রেণি: **মোবাইল:**

* সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখঃ ৩১ জানুয়ারী ২০২০ ইংরেজি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য।

* উত্তরপত্রটি স্ক্যান করে মেইল করতে পারেন। ই-মেইল: monthlydawah@gmail.com

স্প্রিং ২০১৯

দা'ওয়াহ মেরিট অ্যাওয়ার্ড পেলেন যারা . . .

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে 'দা'ওয়াহ মেরিট অ্যাওয়ার্ড চালু করেছে। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় যারা জিপিএ-৩.৯০ থেকে জিপিএ-৪.০০ অর্জন করেন তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড হিসেবে সনদ, ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দা'ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম